Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আশরাফুন্নাহার আফরিন

রোলঃ 228020641

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আশরাফুন্নাহার আফরিন

রোলঃ 228020641

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আশরাফুন্নাহার আফরিন, আইডিঃ 228020641 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

আশরাফুন্নাহার আফরিন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

আশরাফুন্নাহার আফরিন

আইডিঃ 228020641

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

বাংলাদেশের ভূখণ্ডে মিশনারী কার্যক্রমের সূচনা 8

খ্রিস্টানদের বিভিন্ন অপতৎপরতা 9

প্রচার প্রচারণার অপকৌশল 13

বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় মিশনারি কার্যক্রম 15

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মিশনারি কার্যক্রম 22

সমিতি ও সভায় ধর্মপ্রচার 23

প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করার পর খোঁজ নেয় না মিশনারী 24

উত্তরবঙ্গে খ্রিস্টান মিশনারী অপতৎপরতা 28

খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারক 29

খৃষ্টান বানানোর অপকৌশল 31

২০২৫ সাল পর্যন্ত খৃষ্টানদের বিভিন্ন টার্গেট ও পরিকল্পনা 37

ইহুদি-খ্রিস্টানদের সম্পর্কে আল্লাহর বাণী 39

ইহুদি-খ্রিস্টানদের ইতিহাস চির কপটতার ইতিহাস 43

মুসলিম হিসেবে আমাদের করনীয় 48

খ্রিস্টান মিশনারী অপতৎপরতা প্রতিরোধের উপায় সমূহ 53

খ্রিস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে একজন দায়ীর সফলতা ও কিছু প্রস্তাব 55

আল্লাহর পথে দাওয়াতের গুরুত্ব 61

উপসংহার 65

ভূমিকা

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের দেশ বাংলাদেশ। এদেশের বেশিরভাগ মানুষই মুসলিম। মুসলিমদের পাশাপাশি অন্য ধর্মের লোকেদেরও বসবাস রয়েছে এদেশে। এদেশের মানুষ শান্তিপ্রিয়। সকল ধর্মের লোকই এদেশে শান্তিতে বসবাস করে। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের রয়েছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা। বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের আগমনের ইতিহাস অতি প্রাচীন। মিশনারী হল খ্রিস্টানদের খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার সংস্থা। দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়ন মূল দাবি হলেও তাদের এনজিওগুলো এসব কর্মকাণ্ডের আড়ালে খ্রিস্টান মিশনারির " ধর্মান্তর কর্মসূচি " প্রাধান্য দিয়ে থাকে। খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারে তারা গ্রহণ করে বিভিন্ন ধরনের অপকৌশল। পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা, মুসলিম ঐতিহ্যবাহী নকশা নকল ইত্যাদির মাধ্যমে তারা গ্রামের অশিক্ষিত, সহজ সরল বোকা মানুষদের কে খ্রিস্ট ধর্মের দাওয়াত দিয়ে থাকে। নকল ইমাম ও পীর সাহেব এর মাধ্যমে তারা গ্রামের সহজ সরল মানুষদের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার ও প্রসারে অপকৌশল অবলম্বন করে থাকে। বিভিন্ন জেলায় জেলায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, এনজিও, বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, সেবা ও উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডের আশ্বাস দিয়ে তারা ধাপে ধাপে মানুষদেরকে খ্রিস্টান ধর্মের দাওয়াত এবং ধর্মান্তরিত করে। আদিবাসী ভাইদের মধ্যেও তারা চালায় এই মিশনারী তৎপরতা। খ্রিস্টান মিশনারী ও তাদের সহযোগী এনজিওগুলোর প্রধান লক্ষ্য বিশ্বে খ্রিস্টান জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটানো। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমাদের দেশে খ্রিস্টান মিশনারি ও তার সহযোগী সংস্থা গুলো কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে তারা অনেকটা সফল। বাংলাদেশের খ্রিস্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করলেই তার প্রমাণ মিলে। দিন দিন বাংলাদেশের খ্রিস্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধি এর দায় কি আমি একজন মুসলিম হিসেবে এড়িয়ে যেতে পারি! ইসলাম হলো আমাদের কাছে আমানত। আমরা কি সেই আমানত তাদের কাছে পৌঁছেছি? আমি তিন বেলা ভালো খেতে পারছি, ভালো পোশাক পরিধান করতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু আমার বাড়ির পাশের কোন ভাই খেলো কিনা, পোশাকের ব্যবস্থা আছে কিনা, সন্তান-সন্ততি নিয়ে তিনি কিভাবে জীবন যাপন করছেন তার খোঁজ নেওয়ার কি প্রয়োজন মনে করেছি কখনো? আল্লাহর কাছে এর জন্য কি আমাদের জবাবদিহি করতে হবে না? আজ বেঁচে থাকার তাগিদে সামান্য কিছু টাকার জন্য সামান্য কিছু সুযোগ সুবিধার জন্য আমাদের আশেপাশের ভাইরা প্রয়োজনে পড়ে খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছেন। এর দায় কি আমরা এড়াতে পারি? একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্বের গাফিলতি, দাওয়াতি কাজে অবহেলা, ইসলাম প্রচার এর মত ফরজ কাজকে আনুষঙ্গিক কাজ মনে করা ইত্যাদি আমাদের দেশে খ্রিস্টানদের মিশনারি কার্যক্রম চালানোর অনূকুল পরিবেশ পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। মুসলিমদের অবহেলায় আর গাফিলতিতে এভাবে যদি চলতে থাকে খ্রিস্টানদের মিশনারি কার্যক্রম তাহলে আর বেশি দিন বাকি নেই খ্রিস্টানদের পরিকল্পিত ও ঘৃণিত লক্ষ্য

পূরণ হতে। জীবন ধারণের তাগিদে, খ্রিস্টানদের অপপ্রচারণায় সামান্য কিছু সাহায্যের আশায় নিজ ধর্ম ত্যাগ করে পরকালীন অনিশ্চিত ও ভয়ংকর অনন্তকালের জীবনের দিকে ধাবিত হচ্ছে আমাদের দেশের কিছু সহজ-সরল ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষ। অথচ একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের হতদরিদ্র ভাইদের সাহায্য করা তো দূরের কথা তাদের নিয়ে চিন্তা করার সময়ও যেন আমাদের নেই। অনেকেই তো অর্থের লোভে পড়ে এবং অনেকেই সঠিক জ্ঞানের অভাবে দিনদিন খ্রিস্টানদের এই কুচক্রী জালে ফেঁসে যাচ্ছেন।

عَنْ أَبِي عَمرٍو جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا فِيْ صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَجَاءَهُ قَومٌ عُرَاةٌ مُجْتَابي النِّمَار أَوْ العَبَاء مُتَقَلِّدِي السُّيُوف عَامَّتُهُمْ مِن مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لمَاَّ رَأَى بِهِمْ مِنَ الفَاقَة فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِلَى آخر الآية إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ، والآيَة الأُخْرَى التي في آخر الحَشْرِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرهمِهِ، مِنْ ثَوبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ - حَتَّى قَالَ - وَلَوْ بِشقِّ تَمرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعجِزُ عَنهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَومَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ سَنَّ في الإِسلامِ سنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورهمْ شَيءٌ، وَمَنْ سَنَّ في الإِسْلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهمْ شَيءٌرواه مسلم

আবূ আমর জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আমরা দিনের প্রথম ভাগে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট ছিলাম। অতঃপর তাঁর নিকট কিছু লোক এল, যাদের দেহ বিবস্ত্র ছিল, পশমের ডোরা কাটা চাদর (মাথা প্রবেশের মত জায়গা মাঝে কেটে) পরে ছিল অথবা ‘আবা’ (আংরাখা) পরে ছিল, তরবারি তারা নিজেদের গর্দানে ঝুলিয়ে রেখেছিল। তাদের অধিকাংশ মুযার গোত্রের (লোক) ছিল; বরং তারা সকলেই মুযার গোত্রের ছিল। তাদের দরিদ্রতা দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। সুতরাং তিনি (বাড়ির ভিতর) প্রবেশ করলেন এবং পুনরায় বের হলেন। তারপর তিনি বেলালকে (আযান দেওয়ার) আদেশ করলেন। ফলে তিনি আযান দিলেন এবং ইকামত দিলেন। অতঃপর তিনি নামায পড়ে লোকদেরকে (সম্বোধন করে) ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, “হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু’জন থেকে বহু নরনারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করেছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট চাওয়া এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।” (সূরা নিসা ১) অতঃপর দ্বিতীয় আয়াত যেটি সূরা হাশরের শেষে আছে সেটি পাঠ করলেন, “হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর

প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামীকালের (কিয়ামতের) জন্য সে অগ্রিম কী পাঠিয়েছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।" (সূরা হাশর ১৮)

"সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা), দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা), কাপড়, এক সা' গম ও এক সা' খেজুর থেকে সাদকাহ করে।"এমনকি তিনি বললেন, "খেজুরের আধা টুকরা হলেও (তা যেন দান করে)।" সুতরাং আনসারদের একটি লোক (চাঁদির) একটি থলে নিয়ে এল, লোকটির করতল যেন তা ধারণ করতে পারছিল না; বরং তা ধারণ করতে অক্ষমই ছিল। অতঃপর (তা দেখে) লোকেরা পরস্পর দান আনতে আরম্ভ করল। এমনকি খাদ্য সামগ্রী ও কাপড়ের দু'টি স্তূপ দেখলাম। পরিশেষে আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চেহারা যেন সোনার মত ঝলমল করছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "যে ব্যক্তি ইসলামে ভাল রীতি চালু করবে, সে তার নিজের এবং ঐ সমস্ত লোকের সওয়াব পাবে, যারা তার (মৃত্যুর) পর তার উপর আমল করবে। তাদের সওয়াবের কিছু পরিমাণও কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতির প্রচলন করবে, তার উপর তার নিজের এবং ঐ লোকদের গোনাহ বর্তাবে, যারা তার (মৃত্যুর) পর তার উপর আমল করবে। তাদের গোনাহর কিছু পরিমাণও কম করা হবে না।" (মুসলিম ২৩৯৮, নাসাঈ ২৫৫৪, ত্বাবারানী ২২৬২, ইবনে মাজাহ ২০৩, তিরমিযী ২৬৭৫)

হাদিস সম্ভার, হাদিস নং ১৬২২
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে মুসলমানদের সতর্ক দৃষ্টি এবং দাওয়াতি কাজকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণের মাধ্যমে খ্রিস্টানদের এই অপপ্রচারকে দমিয়ে দেওয়া সম্ভব। নয়তো পরকালে আল্লাহর শাস্তি থেকে আমরা কেউই রক্ষা পাবো না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

اُدۡعُ اِلٰی سَبِیۡلِ رَبِّکَ بِالۡحِکۡمَۃِ وَالۡمَوۡعِظَۃِ الۡحَسَنَۃِ وَجَادِلۡہُمۡ بِالَّتِیۡ ہِیَ اَحۡسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّکَ ہُوَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ ضَلَّ عَنۡ سَبِیۡلِہٖ وَہُوَ اَعۡلَمُ بِالۡمُہۡتَدِیۡنَ﴿۱۲۵﴾

সূরা নাহল :১২৫

তুমি নিজ প্রতিপালকের পথে মানুষকে ডাকবে হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে আর (যদি কখনও বিতর্কের দরকার পড়ে, তবে) তাদের সাথে বিতর্ক করবে উৎকৃষ্ট পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যারা তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন এবং তিনি তাদের সম্পর্কেও পরিপূর্ণ জ্ঞাত, যারা সৎপথে প্রতিষ্ঠিত।

اِذۡہَبَاۤ اِلٰی فِرۡعَوۡنَ اِنَّہٗ طَغٰی ﴿ۚ۴۳﴾ فَقُوۡلَا لَہٗ قَوۡلًا لَّیِّنًا لَّعَلَّہٗ یَتَذَکَّرُ اَوۡ یَخۡشٰی ﴿۴۴﴾

সূরা তোহা (৪৩,৪৪)
উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাওয়া শেষ সীমালংঘন করেছে। তোমরা গিয়ে তার সাথে নম্র কথা বলবে। হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা(আল্লাহকে) ভয় করবে।

বাংলাদেশের ভূখণ্ডে মিশনারী কার্যক্রমের সূচনা

মূলত ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্তুগিজরা খ্রিস্টান মিশনারীদের সাথে নিয়েই এদেশে আগমন করে। মুঘল সম্রাট আকবর ভারতের বাঙাল প্রদেশের হুগলিতে পর্তুগিজদের বসতি স্থাপনের অনুমতি দেন। তাদের ছত্রছায়ায় খ্রিস্টানরা প্রায় ২০০ বছর খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করেন। অতঃপর তারা বাংলার বিভিন্ন এলাকায় গির্জা প্রতিষ্ঠা করে, স্কুল বানায় ও হাসপাতাল চালু করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন চলে বলে কৌশলে পুরো ভারতের ক্ষমতা দখল করে নেয়, তখনো তারা তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখে। বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা, স্বাস্থ্য সেবা, ঋণ সুবিধা, বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা ইত্যাদির মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা।
এনজিও প্রশিক্ষণে নামে তাদের মিশনারি প্রশিক্ষণের জন্য ১৯৬৯ সালে ভারত এবং সিঙ্গাপুরে “হ্যাগাই ইনস্টিটিউশন” নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। মুসলমানদেরকে খ্রিস্টান বানানোর জন্য তারা লক্ষ লক্ষ ধর্ম প্রচারকে প্রশিক্ষণ দিয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। ১৯৮৫ সালে প্রায় ২.৫ লক্ষ পশ্চিমা ধর্মপ্রচার ৩৫০০টি পশ্চিমা মিশনারি সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে এশিয়া ও আফ্রিকায় সক্রিয় ছিল। তাদের সহযোগী হিসেবে ছিল ৩৫ লক্ষ স্থানীয় ধর্মপ্রচারক। ১৯৮৫ সালে মিশনারিদের পরিচালিত রেডিও টিভি স্টেশনের সংখ্যা ছিল ১৫৮০টি এবং সব ভাষায় প্রকাশিত সাময়িকি সংখ্যা ছিল ২১০০০। ১৯৮৫ তারা বাইবেল (নিউ টেস্টামেন্ট) বিতরণ করেছে ৬ কোটি ৪০ লক্ষ কপি। আন্তর্জাতিক খ্রিস্টান মিশনারী গবেষণা বুলেটিন থেকে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে ১৯৯১ সালে বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টান প্রচার ও ইসলামী জাগরণকে প্রতিহত করতে ১,২০,৮৮০ প্রতিষ্ঠান ও এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে খ্রিস্টান ধর্মান্তরিত লোকের সংখ্যা বিশ্ব জুড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে এর জরিপ খুবই উদ্বেগজনক। ১৮৮১ সালে প্রতি ৬ হাজার লোকের মধ্যে ১জন খ্রিস্টান ছিল। এ সংখ্যা যেন জ্যামিতিক খালি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭৪ সালে প্রতি ৩২৬ জনের মধ্যে ১জন, ১৯৮১ সালে ২৯ জনের মধ্যে ১ জন, ১৯৯১ সালে প্রতি ২২ জনের মধ্যে ১ জন খ্রিস্টান রয়েছে বলে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। ১৯৩৯ সালে খ্রিস্টান জনসংখ্যা ছিল ৫০ হাজার। ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ লাখে। ২০০১ চালের আদমশুমারিতে তা এক

কোটি ছাড়িয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বর্তমান সময়ে তা যে আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

খ্রিস্টানদের বিভিন্ন অপতৎপরতা

বহুকাল থেকে খ্রিস্টানরা তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানা ধরনের অপকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। এখনো তারা তাদের কর্মীদের নিয়ে নানা ধরনের সেমিনার, আলোচনা সভা এবং পরামর্শ মূলক আলোচনা সভার আয়োজন করে থাকে। সেসব আলোচনা সভায় তারা তাদের অগ্রগতি, দুর্বলতায় এবং ভবিষ্যতে আরো বেগবান ভাবে তাদের এই খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে কিভাবে সফলভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে তানিয়ে আরাপচারিতা করে থাকে। খ্রিস্টান ধর্মে পরিচিতি মূলক বিভিন্ন বই, লিফলেট বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। ইসলাম ধর্মের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টিকারী এবং আক্রমণাত্মক প্রচার পত্র বিলি করে। তারা সহজ সরল মানুষদের কাছে ইসলাম ধর্মের বিকৃতি মূলক নানা দিক তুলে ধরে। চিকিৎসা সেবা এবং জনসাধারণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের নামে তারা অসহায় দরিদ্র মানুষের মনে ধর্মের নামে সংশয়ের বীজ বপন করে। তারপর চিকিৎসা সেবাকে অজুহাত করে খ্রিস্ট ধর্মের বীজ বপন করে। একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের দেশে চিকিৎসা সেবায় ডাক্তারের অভাব থাকায় তার সুযোগ নিয়ে স্বল্পমূল্যে উন্নত সেবা দেয়ার আশ্বাস দিয়ে তারা চিকিৎসা সেবা প্রার্থী মানুষের মধ্যে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচারণা চালায়। আর এ কারণেই সেবা খাতে তাদের এই অপকৌশল অনেকটাই সফলকাম বলা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় জেলায় তারা গড়ে তুলেছে বিভিন্ন মিশনারি স্কুল। অভিভাবকদেরকে বাচ্চাদের উন্নত ভবিষ্যতের আশ্বাস দিয়ে স্বল্প খরচে তারা তাদের বাচ্চাদেরকে সেখানে পড়াতে উদ্বুদ্ধ করে। আর এর ওই মাধ্যমে কচি বাচ্চাদের মনে রোপন করা হয় খ্রিস্ট ধর্মের বীজ। খাওয়ার শুরুতে যীশুকে স্মরণ করো, পড়ার শুরুতে যীশুর নাম নাও, অসুস্থ হলে যীশুর কাছে যাও এভাবে কৌশলে মুসলিম বাচ্চাদের অন্তরে যিশুর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টির মাধ্যমে খ্রিস্ট ধর্মের বীজ বপন করা হয়। শুধু শিশু বাচ্চাদের ক্ষেত্রেই নয় বরং কর্মক্ষম বেকার যুবক যুবতীদের মধ্যেও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, বিদেশি ভাষা শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করার পাঁয়তারা করে। বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের সংকুলান থাকায় তারা এই ক্ষেত্রেও অনেকটাই সফলতার মুখ দেখে। দেশে এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে তারা যেমনিভাবে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচারণা করে, দয়া, ভালোবাসা সেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে খ্রিস্ট ধর্মকে সবার কাছে গ্রহণীয় করে তোলার প্রয়াস ব্যক্ত করে তেমনিভাবে বিভিন্ন অপপ্রচারের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের নামে গুজব রটাতেও কমতি রাখেনা। মুসলমানদের আকিদা বিশ্বাস, তাদের ধর্মীয় নিদর্শন এবং তাদের পরস্পরের

দ্বীনি সম্পর্কে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করার মাধ্যমে তাদের বিকৃত খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আহ্বান করে। খ্রিস্টান মিশনারীদের এই ভন্ডামি অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন একজন মুসলিম ব্যক্তিই মাত্র মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তা যথাযথভাবে অনুভব করতে পারবেন। খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা বা আর্থিক সাহায্যের নামে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে ধর্মান্তরিত করা " লুকানো চাপ " বা "Soft coercion" হিসেবে সমালোচিত। ভ্রান্ত তথ্য পরিবেশন, প্রলোভনমূলক প্রতিশ্রুতি, ভুয়া অলৌকিক ঘটনা বা মিরাকল দেখানো, নাম ও পরিচয় ভিন্নতা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষকে গোমরাহীর মধ্যে রেখে ধর্মের প্রচারণা করে। বিভিন্ন আয়াতের আংশিক প্রয়োগ এবং নিজেদের মনগড়া বানোয়াট অনুবাদ এবং বাইবেলের স্ব পক্ষে অপব্যাখ্যা দিয়ে নানা রকম পস্তুকাদি প্রকাশ ও প্রচার করে। যেমন ত্রিত্তবাদের মধ্যে আল্লাহ এক, ইঞ্জিল ও কুরআনের ঈসা কালিমাতুল্লাহর ব্যক্তিসত্তা রক্তমাংসের দেহে আবৃত, আমরা কিভাবে সালাত কায়েম করি?

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَنَّهُ قَالَ: "يَا عِبَادِي: إنِّي حَرَّمْت الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْته بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا؛ فَلَا تَظَالَمُوا. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلَّا مَنْ هَدَيْته، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إلَّا مَنْ أَطْعَمْته، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارٍ إلَّا مَنْ كَسَوْته، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ. يَا عِبَادِي! إنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا؛ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ. يَا عِبَادِي! إنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْت كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَته، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ. يَا عِبَادِي! إنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إيَّاهَا؛ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَن إلَّا نَفْسَه."ُ
]رَوَاهُ مُسْلِم.[ٌ

আবূ যর আল-গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বর্ণনা করেছেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বরকতময় ও সুমহান রবের নিকট হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ বলেছেনঃ "হে আমার বান্দাগণ! আমি যুলুমকে আমার জন্য হারাম করে দিয়েছি, আর তা তোমাদের মধ্যেও হারাম করে দিয়েছি; অতএব তোমরা একে অপরের উপর যুলুম করো না।
হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে হেদায়াত দিয়েছি সে ছাড়া তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট। সুতরাং আমার কাছে হেদায়াত চাও, আমি তোমাদের হেদায়াত দান করব।

হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে অন্ন দান করেছি, সে ছাড়া তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত। সুতরাং তোমরা আমার নিকট খাদ্য চাও, আমি তোমাদের খাদ্য দান করব।
হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সবাই বিবস্ত্র, সে ব্যতীত যাকে আমি কাপড় পরিয়েছি। সুতরাং আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্রদান করব।
হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাতদিন গোনাহ্ করছ, আর আমি তোমাদের গোনাহ্ ক্ষমা করে দেই। সুতরাং আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব।
হে আমার বান্দাগণ! তোমরা কখনোই আমার ক্ষতি করার সামর্থ রাখ না যে আমার ক্ষতি করবে আর তোমরা কখনোই আমার ভালো করার ক্ষমতা রাখ না যে আমার ভালো করবে।
হে আমার বান্দাগণ! তোমরা পূর্বাপর সকল মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মোত্তাকী ও পরহেযগার ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই বৃদ্ধি করবে না।
আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বাপর সকল মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পাপী ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই কমাতে পারবে না।
হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বের ও তোমাদের পরের সকলে, তোমাদের সমস্ত মানুষ ও তোমাদের সমস্ত জিন যদি সবাই একই ময়দানে দাঁড়িয়ে আমার কাছে চায় এবং আমি সকলের চাওয়া পূরণ করে দেই তবে আমার নিকট যা আছে তাতে সমুদ্রে এক সুঁই রাখলে যতটা কম হয়ে যায় তা ব্যতীত আর কিছু কম হতে পারে না।
হে আমার বান্দাগণ! আমি তোমাদের আমলকে (কাজকে) তোমাদের জন্য গণনা করে রাখি, আর আমি তার পুরোপুরি প্রতিফল দিয়ে দেব। সুতরাং যে ব্যক্তি উত্তম প্রতিফল পাবে তার আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত, আর যে তার বিপরীত পাবে তার শুধু নিজেকেই ধিক্কার দেয়া উচিত।" [মুসলিমঃ ২৫৭৭]

৪০ হাদিস, হাদিস নং ২৪
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

মুসলমানদেরকে গোমরাহ করার জন্য তারা তাদের বইয়ে কোরআনের আয়াত সংযোজন করে এবং তার ভুলভাল ব্যাখ্যা দেওয়া থাকে, সরলমনা মুসলিমরা তা পড়ে গোমরাহীতে ডুবে ইহকাল এবং পরকাল হারিয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামের ঠিকানা নিশ্চিত করছে। তাদের রচিত বিভিন্ন বইগুলোর শেষে থাকে প্রশ্নোত্তর পর্ব। এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান এবং সঠিক উত্তর প্রদানের মাধ্যমে উপহার হিসেবে আরো নতুন বইপ্রধানের আশ্বাস দেওয়া থাকে। এভাবে ধীরে ধীরে একজন মানুষ তাদের পাতানো ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। তবে তাদের বইগুলোতে পাওয়া বিকৃত কোন মত নিয়ে নেই তাদের কোন সদ উত্তর, এক্ষেত্রে তারা অবলম্বন করে নীরবতার ভাষা। খ্রিস্টান মিশনারিরা তাদের কিতাবুল মুকাদ্দাস ও ইঞ্জিল শরীফের মলাট সম্পূর্ণ ইসলামী

ঐতিহ্যের ধারক প্রচ্ছদে অলংকৃত করে প্রকাশ করে। বিভিন্ন রঙের সাদৃশ কভারের উপর সোনালী রঙের ইসলামিক ধাঁচের প্রচ্ছদ দেখে এটাকে পবিত্র কোরআনের তাফসির ও হাদিস গ্রন্থ বলে ভুল করা অস্বাভাবিক নয়।

খ্রিস্টানরা তাদের বাইবেল নিয়ে মুসলমানদের দাওয়াত দেয় না। ইসলামী বইয়ের কাভার এবং ইসলামী নামে কিছু বইয়ের মাধ্যমে তারা মুসলমানদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে খ্রিস্ট ধর্মে অনুপ্রাণিত করে। বাণী ও বাণীবাহক,গুনাহগারদের জন্য বেহেস্তে যাওয়ার পথ, কোরআনের আলোকে বেহেস্তে যাওয়ার পথ, আল্লাহর কালামের নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা, কুরআনের আলো, ইমামদের জন্য কিতাবুল মুকাদ্দাসের প্রশিক্ষণ, আল্লাহর বান্দা, ইসায়ী যোগাযোগ, আল্লাহ তাআলার মহাব্বত, নবী ইব্রাহিমের ধর্ম কি ছিল? , ইসমাইলের ঈমান, বেহস্তি মানুষ, বাইবেলের ২৪ টি গল্প, আনন্দের পথ, আসমানী কিতাব শিক্ষা প্রভৃতি বই উল্লেখযোগ্য। ইসমাইলের ঈমান বইটি খ্রিস্টানদের একটি বই। বইটির ইনার পেজের শুরুতে “বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম” লেখা আছে। এরপর বাংলায় লেখা আছে “আসসালামু আলাইকুম “। এরপর আবার আরবিতে লেখা আছে “ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম “।যেকোনো ব্যক্তি বইটি দেখে মনে করবে এটি কোন বড় আলেমের লেখা বই। এভাবে তাদের প্রকাশিত প্রতিটি বইয়েই রয়েছে বিভ্রান্তিকর এবং আপত্তিকর তথ্য। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাদের চক্রান্ত থেকে হেফাজতে থাকার তৌফিক দান করুন। কাফিরদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালার সুস্পষ্ট সতর্কবাণী -

وَاِذۡ یَمۡکُرُ بِکَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا لِیُثۡبِتُوۡکَ اَوۡ یَقۡتُلُوۡکَ اَوۡ یُخۡرِجُوۡکَ ؕ وَیَمۡکُرُوۡنَ وَیَمۡکُرُ اللّٰہُ ؕ وَاللّٰہُ خَیۡرُ الۡمٰکِرِیۡنَ﴿۳۰﴾

সূরা আনফাল: ৩০

(হে নবী! সেই সময়কে স্মরণ করো) যখন কাফেরগণ তোমাকে বন্দী করা অথবা তোমাকে হত্যা করা কিংবা তোমাকে (দেশ থেকে) বহিষ্কার করার জন্য তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল। তারা তো নিজেদের ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিল আর আল্লাহও নিজ কৌশল প্রয়োগ করছিলেন। বস্তুত আল্লাহ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৌশল কারী।

প্রচার প্রচারণার অপকৌশল

খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারণায় খ্রিস্টানরা বরাবরই নানা ধরনের অপকৌশল অবলম্বন করে এসেছে। ইসলামি মোড়কে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার তাদের একটি প্রচলিত আপপন্থা। খ্রিস্টানরা মুসলমানদের ধোকা দেওয়ার জন্য কোরআন শরীফের আয়াত বিকৃত করে। মাঝে মাঝে বিভিন্ন শব্দ দিয়ে তাদের মনমতো কোরআন শরীফ লিখেছে। যা দিয়ে একজন সাধারণ মুসলমানকে তারা সহজেই ধোঁকা দিতে পারে। কিন্তু একজন আলেমের কাছে যা সহজেই ধরা পড়বে তার বিভিন্ন ব্যাকরণগত ভুলের কারণে। তারা নিজেরাই বিভিন্ন সুরা বানিয়েছে এবং নিজেরাই সেগুলোর নামকরণ করেছে। সুরাতুল হায়াত, সূরাতুল কিতাব, সুরাতুল আফজাল, সুরাতুন নাবি, সূরাতুল ঈমান ইত্যাদি তাদের বানানো কিছু সূরা।

খ্রিস্টানরা ভালো করেই জানে মুসলমানদের সাথে যুক্তি তর্কে তারা পারবে না। তাই নানা ধরনের অপক কৌশল তারা ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। আর তাদের একটি বিশেষ কৌশল হল ভুল এবং বিতর্কিত তথ্য মুসলমান সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদে সৃষ্টি করা, মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের ফাটল ধরানো, সন্দেহের উদ্বেগ ঘটানো। এ ধরনের অপ কৌশল অবলম্বন কেই তারা তাদের সফলতার অন্যতম পথ হিসেবে মনে করে। তবে তারা এক্ষেত্রে অনেকটাই সফল যা আমাদের দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝা যায়। খ্রিস্টান পাদ্রী বা খ্রিস্টান ধর্মযাজক মুসলিমদের মাঝে দাওয়াতি কার্যক্রম চালায় না। বরং মুসলমানদের মাঝে খ্রিস্ট ধর্মের দাওয়াতী কার্যক্রম চালায় তাদেরি বানানো তথাকথিত নকল ইমাম, নকল মসজিদের খতিব, তাদের বানানো পীর সাহেব। এতে সাধারণ মুসলিমরা বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। কিছু কিছু তো অভাবের তাড়নায় সাহায্যের লোভে পড়ে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে আবার কিছু কিছু অপকৌশল এর ফাঁদে পড়ে নিজেতো ধর্মান্তরিত হয় এবং পরবর্তীতে সেই খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারণার কাজেও নিয়োজিত হয়। এতে একজন মুসলিম যেমন চিরস্থায়ী জাহান্নাম নিশ্চিত করে তেমনিভাবে তার অপর মুসলিম ভাইবোনদের জন্য ডেকে আনে চিরস্থায়ী বিপদ। যেখানে একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেয়া। সেখানে খ্রিস্টানরা আমাদেরকেই বিভ্রান্তিতে ফেলে মুসলিমদের মাধ্যমেই মুসলিমদেরকে খ্রিস্ট ধর্মের দাওয়াত দিচ্ছে। এর চেয়ে ভীতিকর পরিস্থিতি আর কি হতে পারে! আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ، أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيٌّ كَثِيرَةٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ قَلِيلَةٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتُرَوْنَ أَنَّ اللهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ قَالَ الآخَرُ: يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا، وَلاَ يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا وَقَالَ الآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا، فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ) الآيةَ

‘আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, কা‘বার কাছে দু’জন কুরাইশী এবং একজন সাকাফী অথবা দু’জন সাকাফী ও একজন কুরাইশী একত্রিত হয়। তাদের পেটের মেদ ছিল অধিক; কিন্তু অন্তরে বুদ্ধি ছিল কম। তাদের একজন বলল, তোমাদের কি ধারণা, আমরা যা বলছি তা কি আল্লাহ্ শুনছেন? উত্তরে অপর এক ব্যক্তি বলল, আমরা যদি জোরে বলি, তাহলে তিনি শুনতে পান। আর যদি চুপে চুপে বলি, তাহলে তিনি শুনতে পান না। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, আমরা জোরে বললে যদি তিনি শুনতে পান, তাহলে চুপে চুপে বললেও তিনি শুনতে পাবেন। তখন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন, ‘তোমাদের চোখ, কান এবং তোমাদের চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, এ থেকে তোমরা কখনো নিজেদের লুকাতে পারবে না..... (হা মীম সিজদাহঃ ২২; আয়াতের শেষ পর্যন্ত)। (বুখারী পর্ব ৬৫, অধ্যায় ২, হাদীস নং ৪৮১৭;)

আল লু'লু ওয়াল মারজান, হাদিস নং ১৭৬৮
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

এলাকার মসজিদের খতিব সাহেব জুমার দিনের খুতবায় আপত্তিকার কথা বলার মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন। যেখানে একজন খতিবের দায়িত্ব ছিল এলাকার মুসলিমদের মনে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি এবং দাওয়াতী কাজে উদ্বুদ্ধ করা। মসজিদের খতিব খ্রিষ্টান কিন্তু এলাকার মানুষ তা ধরতেই পারে না বরং তার দেওয়া খুতবা শুনে বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। যা একজন খ্রিস্ট ধর্মের প্রচারকের দ্বারা সম্ভবপর করা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। এলাকায় খ্রিস্ট ধর্মের দাওয়াত প্রত্যক্ষভাবে দেওয়ার ফলে এলাকার মানুষই তাদেরকে এলাকার ছাড়তে বাধ্য করতেন তাই খ্রিস্টানরা এই অপকৌশল অবলম্বন করেছে। মসজিদের খতিব যখন খুতবায় আপত্তিকর কথাবার্তা বলে তখন একজন সাধারণ মুসলিম হিসেবে তাতে প্রভাবিত হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। আর এই সুযোগটাকেই কাজে লাগিয়ে খ্রিস্টানরা খ্রিস্ট ধর্মের অপপ্রচার চালিয়ে গেছে। মসজিদে খ্রিস্টানদের বানানো খ্রিস্টান খতিবের কিছু বাণী - নামাজ পড়তে পড়তে যদি কারো কপালে দাগ পড়ে যায় তবুও সে জাহান্নামে যাবে, কিয়ামতের পূর্বে ঈসা আলাইহিস সালাম আসবেন, তখন তো তাকে মানতেই হবে তাহলে এখন মানতে অসুবিধা কোথায়? মাটির নিচে নবী উত্তম না আসমানের উপরের নবী উত্তম? জিন্দা নবী উত্তম মৃত নবী উত্তম? ইত্যাদি। একজন সাধারণ মুসলিমের মনে সন্দেহ এবং সংশয় সৃষ্টির জন্য এ ধরনের কথায় কি যথেষ্ট নয়? যখন তা বলছেন একজন মসজিদের খতিব! এরপরও কি আমাদের বোঝার বাকি থাকে যে খ্রিস্টানরা ভেতরে ভেতরে তাদের দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে নিতে আর কত ধরনের অপচেষ্টা এবং অপকৌশল অবলম্বন করেছে আর তারা তাতে কতটাই না সফলকাম। খ্রিস্টানদের এসব ভুলভাল পড়ে অনেকে তো নাজাতের আশায় ও খ্রিস্টান

ধর্ম গ্রহণ করছে। তা কতই না ভয়ংকর! শুধু মসজিদে ভন্ড খতিব নয় বরং বিভিন্ন ভন্ড পীর সাহেব তৈরীর মাধ্যমে ও তারা খ্রিস্ট ধর্মের দাওয়াতি কার্যক্রম চালায়। শান্তিপ্রিয় এই দেশ বাংলাদেশে মুসলিম ঐক্য যে এখনো বর্তমান তা বুঝতে পেরেই খ্রিস্টানরা তাদের ধর্ম প্রচারণার পদ্ধতি বদলিয়েছে। এলাকার কেউ খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে নাম পরিবর্তন করলে এলাকার মানুষের চাপে সে বাধ্য হয় আবার ইসলাম ধর্মে ফিরে আসতে। তাই খ্রিস্টানরা আর ধর্মান্তরিত কোন নাম মুসলিমের নাম পাল্টায় না বরং এমন নাম দেয় যা আদতে একজন খাঁটি মুসলিম এরই নাম বলে মনে হয়। আর তারা তাদের পরিচয় খ্রিস্টান না দিয়ে বরং বলে যে ঈসায়ী মুসলমান। যাতে এলাকার মানুষ সন্দেহ করার সুযোগ না পায়। খ্রিস্টানরা তাদের নিজস্ব কালিমা ও বানিয়েছে " লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইসাহী মসীউল্লাহ"।এর কারণ হলো যাতে তারা খ্রিস্টান হয়েও মুসলমান সমাজে যেমন থাকতে পারবে তেমনি মুসলিমদের মাঝেও খ্রিস্ট ধর্মে দাওয়াতই প্রচারণা চালাতে পারবে। তাদের পরিকল্পনা কতই না ভয়ংকর!
কুরআনে আল্লাহ কালার সুস্পষ্ট বাণী -

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ
সূরা আত তাওবাহ -৩২
তারা আল্লাহর নূরকে তাদের মুখের (ফুঁ) দ্বারা নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ তার নূরের পূর্ণ উদ্ভাসন ছাড়া আর কিছুতেই সম্মত নন, তাতে কাফেরগণ এটাকে যতই অপ্রীতিকর মনে করুক।

বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় মিশনারি কার্যক্রম

বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকাকে ঘিরে এন জি ও এবং আন্তর্জাতিক খ্রিষ্টান লবি ভিন দেশী সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে সুদীর্ঘ কাল ব্যাপী নানা মুখী চক্রান্ত চালিয়ে আসছে। চিকিৎসা, সমাজ ও মানবতার সেবার অভিনয়ে তারা মূলতঃ পার্বত্য এলাকার দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীকে ইউরোপীয় জীবনাচার ও দর্শনের দিকে আকৃষ্ট করার প্রয়াস চালাচ্ছে। মুঘল আমলেই এদেশের প্রতি এন জি ও এবং খ্রিষ্টান মিশনারীদের শ্যেন দৃষ্টি পতিত হয়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে মিশনারীগণ ভিন দেশী সংস্কৃতির বিকাশ ও ধর্মান্তরের যে প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে চালু করেন, পর্যায়ক্রমে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে তার ক্রমবিকাশ সাফল্যের সাথে অব্যাহত থাকে। স্কুল প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, হাসপাতাল স্থাপন, ঋণ প্রদান, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, দারিদ্র্য বিমোচন, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ও নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি মুখরোচক কর্মসূচীর আড়ালে রয়েছে এ দেশে ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচার করার নীল নকশার বাস্তবায়ন। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় প্রায় ৪৫টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর অধিবাস। শত বছর ধরে বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত

হয়ে ২০ লাখ আদিবাসী ক্রমাগত প্রান্তীয় পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, চরম দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অনাহার, মৃত্যু, মহামারী, অপুষ্টি ও স্যানিটেশন সমস্যা তাদের নিত্যসঙ্গী। খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থান এই পাঁচটি মৌলিক মানবাধিকার থেকে তাঁরা বঞ্চিত। রাখাইন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মি.উসিথ মং বলেন, রাখাইনরা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী হিসেবে এই অঞ্চলে আদিম অধিবাসী। প্রায় ৩৩ শতাংশ রাখাইন এখন ভূমিহীন আর গত ৩৫ বছরে পটুয়াখালীতে প্রায় ৯০ শতাংশ রাখাইনকে নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ হতে হয়েছে।১৯৯১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামের জন সংখ্যা ১০ লাখ ৫ হাজার ৩৬২ জন। অধিকাংশ চাকমা ও মারমা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, টিপরা অধিবাসিরা হিন্দু ধর্মের আর মিজো বম ও থেয়াং খ্রিষ্টান। কিছু কিছু গোত্র আত্মা, প্রাণী ও উদ্ভিদের পূজারী (বাংলাপিডিয়া, ৫খন্ড, পৃ.৩৭১-২)।

সাধারণভাবে এসব ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী এবং বিশেষভাবে পাহাড়িরা অত্যন্ত কষ্টে আছে, 'মানুষ'করার জন্য নানামুখী সহযোগিতা প্রয়োজন, তাদের পৃথক সত্তা ও নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষা নিশ্চিত করতে হবে ইত্যাদি বক্তব্য দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশেও প্রচুর শোনা যায়। এর সূত্র ধরে বিদেশি ফান্ড দ্বারা পরিপুষ্ট ঝাঁকে ঝাঁকে এনজিও এখন তিন পার্বত্য জেলায় সক্রিয় আছে। কিন্তু এতদিনে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, আর্ত-মানবতার সেবার নামে এসব এনজিও'র বেশিরভাগই আসলে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে ধর্মান্তরিত করার কাজে কোমর বেঁধে নেমেছে। এ কাজে তাদের সাফল্য রীতিমত চোখ ধাঁধানো। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তৈরি করা প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে আমার দেশ-এ প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে,গত ২০ বছরে সেখানে ১২ হাজার উপজাতীয় পরিবারকে ধর্মান্তরিত করে খ্রিস্টান বানানো হয়েছে। ওই রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী, তিন পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটিতে বর্তমানে ১৯৪টি গির্জা উপজাতীয়দের ধর্মান্তরিত করে খ্রিস্টান বানানোর ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। খাগড়াছড়ি জেলায় আছে ৭৩টি গির্জা। ১৯৯২ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এ জেলায় ৪ হাজার ৩১টি পরিবার খ্রিস্টান হয়েছে। বান্দরবান জেলায় গির্জা আছে ১১৭টি। এখানে একই সময়কালে খ্রিস্টান হয়েছে ৬ হাজার ৪৮০টি উপজাতীয় পরিবার। রাঙামাটিতে ৪টি চার্চ খ্রিস্টান বানিয়েছে ১ হাজার ৬৯০টি উপজাতীয় পরিবারকে। এগুলো তুলনামূলকভাবে হাল আমলের হিসাব। পাহাড়ি যেসব জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, তাদের প্রায় শতভাগ খ্রিস্টান হয়ে গেছে অনেক আগেই (এম. এ নোমান, আমার দেশ, ১২.০৮.২০১১)।

ড. উইলিয়াম কেরি, ড.টমাস, রিচার্ড হলওয়ে, ফাদার ক্লাউজ বার্লার, টরবেন ভি পিটারসন, আলফ্রেড রবিন মন্ডল ও ড.অলসন এর মতো লোকেরা বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাইবেলের শিক্ষা, কৃষ্টি ও আদর্শ প্রচারের জন্য বাংলা ভাষা রপ্ত করেন। ১৭৯৩ সালে মিশনারীদের একটি শক্তিশালী দল বাংলাদেশে আসেন। মি.কেরি ও মি. পাওয়েল মিলে

দিনাজপুরে একটি ক্ষুদ্র চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন যা বাংলাদেশে প্রথম ব্যাপ্টিস্ট ও প্রটেষ্ট্যান্ট চার্চ। মি.কেরি নতুন আঙ্গিকে বাংলা ব্যাকরণ সংশোধন করেন এবং ১৮০০ সালে ইংল্যান্ড থেকে বাংলা বর্ণ মালার ছক এনে কলকাতার শ্রীরামপূর মিশন থেকে বাংলায় বাইবেল মুদ্রন ও প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত অবস্থায় ড. কেরি 'কথোপকথন' ও 'ইতিহাসমালা' নামক বাংলায় দু'টি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের সময় ভারতীয় উপমহাদেশে ৯০টি প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টান মিশনারী সংস্থা কর্মরত ছিল। রোমান ক্যাথলিক চার্চের সংখ্যা এর বাইরে (মাসিক তরজমানুল কুরআন, লাহোর, মার্চ, ১৯৬১)। এদেশে প্রতিকুল পরিবেশে খ্রিষ্ট ধর্ম-সংস্কৃতির প্রচার ও বিকাশে তাঁরা যে ত্যাগ ও সাধনা করেন তা রীতিমত বিস্ময়ের উদ্রেক করে। চন্দ্রঘোনা, মালুমঘাট, ময়মনসিংহ, রংপুর ও রাজশাহী সহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাসপাতাল ও মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা করে কুষ্ঠ রোগ সহ জটিল ব্যাধির চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার চালিয়ে আসছে একটি মাত্র লক্ষ্যকে সামনে রেখে, তা হলো এ দেশে খ্রিষ্ট ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রচার ও প্রসার। এই সব হাসপাতাল হলো মূলতঃ মানুষ ধরার ফাঁদ ও ষড়যন্ত্রের নীল কুঠি। মিশনারীদের এই নিরন্তর সাধনা ব্যর্থ হয়নি। উপজাতীয় জন গোষ্ঠীর দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে তাদের শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাবকে পুঁজি করে খ্রিষ্টান এনজিও কর্মি ও মিশনারী পাদ্রীরা দূর্গম পার্বত্য এলাকায় নীরবে-নিভৃতে ধর্মান্তরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশে কর্মতৎপর এনজিও'র সংখ্যা ৩০ হাজার। এই দেশে বহুজাতিক কোম্পানির আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থে এবং অসহায়, নিঃস্ব, নিরক্ষর ও প্রপীড়িত মানুষকে সেবা করার নামে ইউরোপীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও খ্রিষ্ট-ধর্মে দীক্ষিত করার অমানবিক তৎপরতায় যেসব এনজিও জড়িত রয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে: ১.কারিতাস ২.এমসিসি (মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটি) ৩.বাংলাদেশ লুতারান মিশন ৪.দীপ শিখা ৫.স্যালভেশন আর্মি ৬.ওয়ার্ল্ড ভিশন ৭.সিডিএস (সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস) ৮.আরডিআরএস (রংপুর-দিনাজপুর রুরাল সার্ভিস) ৯.সিসিডিবি (খ্রিষ্টান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট) ১০.হিড বাংলাদেশ ১১.সেভেনথ ডে এ্যাডভেঞ্চারিষ্ট ১২.চার্চ অব বাংলাদেশ ১৩.প্লান ইন্টারন্যাশনাল ১৪. সুইডিস ফ্রি মিশন ১৫.কনসার্ণ ১৬.এডরা ১৭.অষ্ট্রেলিয়ান ব্যাপটিষ্ট সোসাইটি ১৭. ফ্যামেলিজ ফর চিলড্রেন ১৮. ফুড ফর হাংরী ইন্টারন্যাশনাল। এই সব সংস্থার বাজেটের শতকরা ৯০ ভাগ অর্থ খ্রিষ্টানদের বা খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হবার সম্ভাবনাময় ব্যক্তিদের স্বার্থে, নির্বাহী কর্মকর্তা ও বিদেশী কনসালটেন্টের পেছনে ব্যয়িত হয়।

চার্চ অব বাংলাদেশ নামে একটি খ্রিষ্টান মৌলবাদী এন, জি, ও সংস্থা ১৯৬৫ সালে কক্সবাজারের মালুমঘাটে খ্রিষ্টান মেমোরিয়াল হাসপাতাল স্থাপন করে। স্থানীয় জনসাধারণের দরিদ্রতা, অভাব ও নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে হাসপাতালের পরিচালক ডা. ভিগা বি অলসন বিগত ৩৮ বছর

যাবত খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারে তৎপর রয়েছেন। ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে অত্র এলাকায় যেখানে এক জন খ্রিষ্টানও ছিলনা সেখানে বর্তমানে দশ হাজার বয়স্ক নাগরিক খ্রিষ্টান হয়েছে এবং তাদের পরিবার সহ এই সংখ্যা বর্তমানে ৪০ হাজারে উন্নীত হয়েছে। মালুমঘাটের আশে পাশের জমি চড়া দামে উক্ত এনজিও কিনে নিচ্ছে ধর্মান্তরিতদের পুর্নবাসনের উদ্দেশ্যে। ইতোমধ্যে হায়দারের নাসি গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে বিশাল গীর্জা গড়ে উঠেছে এবং অত্র এলাকায় ভিন দেশী সংস্কৃতির বিকাশ চোখে পড়ার মতো। কয়েক বছর আগে মালুমঘাট হাসপাতালের ডা. অলসন ১৩টি মুসলিম পরিবারের ২৫ জন গরীব মুসলমানকে ফুসলিয়ে খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করার অভিযোগে সংক্ষুব্ধ শত শত স্থানীয় মানুষ হাসপাতাল আক্রমন করে এবং যেসব ঘরে ধর্মান্তর করা হতো তা জালিয়ে দেয়। বিক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করলে ২০ জন পুলিশ সহ ১০০ ব্যক্তি আহত হয় (দৈনিক সংগ্রাম, ২৪অক্টোবর, ১৯৯২)।

ফস্টার প্যারেন্টস ইন্টারন্যাশনাল নামক একটি এনজিও সংস্থা বাংলাদেশের ৯৬ হাজার পরিবারের একটি শিশুকে পোষ্য সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে খ্রিষ্টান বানানোর এক জঘন্য পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ইতঃপূর্বে ধর্মান্তরিতকরণের অভিযোগে উক্ত সংস্থাকে জাকার্তা, বালি ও সুদান থেকে বহিষ্কার করা হয়। সেভেনথ ডে এডভানচারিষ্ট চার্চ নামক একটি খ্রিষ্টান এনজিও ৮৫টি স্কুল পরিচালনা করে এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল বা এতিমখানায় কোন মুসলমান ছেলেকে ভর্তি করা হয় না। ভারতেও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এই সংস্থাটির প্রতিষ্ঠান রয়েছে। উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের জন্য খ্রিষ্টান কর্মচারী ও খ্রিষ্টান ছাত্রদেরকে সেখানে পাঠিয়ে থাকে। এই সংস্থাটি সেবার নামে বাংলাদেশের মানুষকে খ্রিষ্টান বানানোর জন্য ১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯১-৯২ আর্থিক বছরে ২৩০ মিলিয়ন টাকা খরচ করেছে। হিড বাংলাদেশ নামের এনজিও মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে, ঢাকাস্থ বিহারী রিফিউজি ক্যাম্পে এবং সুন্দরবনে সেবার আড়ালে খ্রিষ্ট সংস্কৃতির প্রচার ও খ্রিষ্টান জনগনের উন্নয়নের জন্য বছরে ৬ লাখ মার্কিন ডলার ব্যয় করে। খ্রিষ্টান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (CCDB) জেনেভা ভিত্তিক একটি খ্রিষ্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের পরিবার প্রথা, সামাজিক ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ধর্মীয় মূল্যবোধ ভেঙ্গে ইউরোপীয় আদলে নতুন সমাজ গড়ার কর্মসূচী বাস্তবায়নে লিপ্ত। সিসিডিবির বার্ষিক ৩.৫ মিলিয়ন মার্র্কিন ডলার বাজেট থেকে খ্রিষ্টান জনগণ এবং ভবিষ্যতে যারা খ্রিষ্টান হবে তারাই উপকৃত হয়। সিসিডিব'র বর্তমান মূল লক্ষ্য হচ্ছে উপজাতি ও আদিবাসীদের সকল জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন স্থিতিশীল ও অংশীদারিত্ব ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চত করার জন্য তাদের ছোট ছোট উদ্যোগকে সমর্থন দান, সকল পর্যায়ে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি। ইউরোপের কয়েকটি দেশ,অস্ট্রেলিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের দাতা সংস্থা ও খ্রিষ্টান মিশনারী সংগঠন বিশেষতঃ জেনেভার ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব চার্চেস, ব্রাড ফর দি ওয়ার্ল্ড, ইংল্যান্ডের খ্রিষ্টান এইড, নিউজিল্যান্ডের চার্চ ওয়ার্ল্ড সার্ভিস এবং হল্যান্ডের ইন্টারন্যাশনাল চার্চ এইড ঢাকা সিসিডিবিকে অর্থ যোগান দেয়।

ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব চার্চেস বছরে একবার সিসিডিবি'র একটি গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। (বাংলাপিডিয়া,১০ খন্ড,পৃ.১৯৮-৯)। লুথারান ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব বাংলাদেশের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত একটি শক্তিশালী এনজিও সংস্থার নাম রংপুর-দিনাজপুর রুরাল সার্ভিস (RDRS)। বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ৬ লাখ লুথারেন বিশ্বাসী এই সংস্থার সাথে জড়িত। নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও ফিনল্যান্ডের লুথারেন চার্চ এই সংস্থাকে অর্থের যোগান দেয়। মি. টরবেন ভি পিটারসনের নেতৃত্বে ১৯৮৬ সাল হতে এই সংস্থা নিরব-কৌশলে প্রায় ২১৮ কোটি ৬৯ লাখ ৯৮ হাজার ৪৭৬ টাকা ব্যয়ে বৃহত্তর দিনাজপুর ও রংপুর জেলার সীমান্ত অঞ্চলের আদিবাসী ও সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকায় ধর্ম প্রচারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সীমান্ত এলাকার বদলে দেশের অভ্যন্তরে প্রকল্প এলাকা সম্প্রসারণে সংস্থা অনাগ্রহী। ১৯৮১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী একমাত্র দিনাজপুরেই ৩৫ হাজার সাঁওতাল খ্রিষ্টান হয়ে গেছে। (মুহাম্মদ নূরুজ্জামান, বাংলাদেশ-এনজিও উপনিবেশবাদের দূর্ভেদ্য জালে, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ.৬১-৭৩; দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৮১)

পাহাড়িদের নিজস্ব সংস্কৃতি অটুট রাখার জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জনকারী পশ্চিমা গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ মদদে চলা ধর্মান্তকরণ সেখানে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে, উপজাতীয়দের নিজস্ব সংস্কৃতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ আজ আক্ষরিক অর্থেই বিপন্ন। তাদের সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। পার্বত্য চট্টগ্রামে খ্রিস্টান হয়ে যাওয়া পাহাড়িদের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি যারা ঘটাচ্ছে তারা যদি পাহাড়িদের রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শিকড় কেটে দিতে সক্ষম হয় তবে তা বাংলাদেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য বড় ধরনের হুমকি হয়ে উঠবে। এভাবে দেশের একটি স্পর্শকাতর এলাকায় ডেমোগ্রাফির নাটকীয় পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়া যায় না। ত্রাণ ও সেবার নামে আসলে ওই অঞ্চলের দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া লোকজনকে ধর্মান্তরিত হতে প্রলুব্ধ করা হচ্ছে বলে জোরালো অভিযোগ রয়েছে। একথা সত্য যে, আমরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সমতলবাসী বাঙালিরা পাহাড়িদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য পর্যাপ্ত সহযোগিতা করিনি। পাশাপাশি এটাও সত্য যে, ব্রিটিশ রাজশক্তি ঔপনিবেশিক আমলে বিশেষ মতলব নিয়ে পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে বিভাজন রেখা টেনে দিয়েছিল যাতে পরস্পরের মধ্যে সার্বিকভাবে দূরত্ব তৈরি হয়। তাদের সেই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ফল এখন পাকতে শুরু করেছে বলে মনে হয় (এম. এ নোমান, আমার দেশ, ১২.০৮.২০১১)।

সাজেক ইউনিয়নটি সীমান্তবর্তী দূর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থিত যা আয়তনে বাংলাদেশের একটি জেলার সমান। নৈসর্গিক সৌন্দর্য লালিত এই উপত্যকায় পৌঁছতে খাগড়াছড়ি বা রাঙ্গামাটি শহর থেকে দু'দিন সময় লাগে। এই ইউনিয়নের বিশটি গ্রামে খেয়াং, রম, পাংখু, লুসাই উপজাতির বাস। সাজেক উপত্যকাটি ভারতীয় সীমান্ত রাজ্য মিজোরাম সংলগ্ন। বিশ বছর আগেও এখানে খ্রিষ্ট ধর্মের কোন নাম গন্ধ ছিল না। উপজাতীয়দের ভাষা, সংস্কৃতি সবই ছিল,

আজ কিছুই নেই। শুধু ইংরেজীতে কথা বলাই নয়; সেখানকার অধিবাসীরা গীটার বাজিয়ে ইংরাজী গান গায়; মেয়েরা পরে প্যান্ট-শার্ট-স্কার্ট; এদের দেখে মনে হয় যেন বাংলার বুকে এক খন্ড ইউরোপ। জাতিতে তারা প্রায় সবাই খ্রিস্টান। দীর্ঘ দিন ধরে এই দুর্গম পার্বত্য এলাকায় খ্রিষ্টান মিশনারীরা অনেক কৌশল ও টাকা ব্যয়ের মাধ্যমে উপজাতীয়দের ধর্মান্তরিত করে চলেছে। ইতোমধ্যে পাংখু উপজাতি পুরোপুরি খ্রিষ্টান হয়ে গেছে; বদলে গেছে তাদের ভাষা; এমন কি তাদের ভাষার হরফও ইংরাজী বর্ণমালায় রূপান্তর করা হয়েছে। এন জিও নাম ধারন করে কয়েকটি খ্রিষ্টান মিশনারী এই দুর্গম এলাকায় হাসপাতাল, বিনোদন কেন্দ্র, চার্চ ইত্যাদি গড়ে তুলেছে। নিজস্ব উপজাতীয় আদি ভাষা ও সংস্কৃতি এরা হারিয়ে ফেলেছে (ইনকিলাব, ২০ মে ২০০৩)।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় গড়ে উঠেছে ক্রশ চিহ্নিত সুদৃশ্য গীর্জা। প্রাথমিক ভাবে মিশনারীদের টার্গেট ছিল হিন্দু ও পাহাড়ী আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং পরবর্তীতে মুসলমান। বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও ময়মনসিংহের গহীন অরন্যে বসবাসরত আধুনিক সভ্যতার আলোকধারা থেকে বঞ্চিত মানুষ বিশেষত: চাকমা, মারমা, তনছইঙ্গা, চাক, খ্যাং, খূমি, বোম, মো, মুরুং, টিপরা, খাসিয়া, মনিপুরী, খেয়াং, পাংখু, লুসাই, মগ, গারো উপজাতির মধ্যে খ্রিষ্ট সংস্কৃতি ও ধর্মের বিকাশ এবং অনুশীলন তাদের জীবন ধারায় এনেছে ব্যাপকতর বৈচিত্র্য ও আমুল পরিবর্তন। প্রতিটি মানুষের জন্য একটি বাইবেল এবং প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্য একটি গীর্জা (Every man a Bible and every People a Church) এ কর্মসূচীকে সামনে রেখে মিশনারীরা যে তৎপরতা বাংলাদেশে শুরু করেছিল তার লক্ষ্য পানে ছুটে চলেছে নিরন্তরভাবে। ১৯৩৯ সালে যেখানে বাংলাদেশে খ্রিষ্টানের সংখ্যা ছিল ৫০ হাজার, সেখানে ১৯৯২ সালে খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০ লাখে; ২০১২ সালে এই সংখ্যা দাঁড়াবে এক কোটিতে। কট্টর মৌলবাদী এনজিও ওয়ার্ল্ড ভিশনের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে ১৯৯১ সালে একমাত্র গারো পাহাড় এলাকায় ১৬ হাজার ভোটার তালিকাভূক্ত হয় এবং খ্রিষ্টান জন শক্তি দাড়াঁয় ৫০ হাজারে।

বর্তমানে হবিগঞ্জ, মৌলভিবাজার, সুনামগঞ্জ ও সিলেটে ৩০ হাজার খাসিয়া জনগণ বাস করে। পার্বত্য খাসিয়াদের বাসভূমি পশ্চিমে গারো পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। দেড় শতাধিক বছর পূর্বে খ্রিষ্টান মিশনারীরা খাসিয়াদের মধ্যে ধর্মপ্রচার শুরু করেছিল। বর্তমানে ৮০%-৯০% খাসিয়া খ্রিষ্টান, প্রায় প্রতিটি পুঞ্জিতে (গ্রাম) গির্জা আছে। প্রতি রোববারে খ্রিষ্টান খাসিয়ারা গির্জায় প্রার্থনা এবং পুঞ্জির বিষয়াদি নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করে। খ্রিষ্টান যাজকগণ অনেক সময় পুঞ্জির বিচার- আচারেরও দায়িত্ব পালন করেন। খ্রিষ্টান কৃষ্টি ও ধর্মে দীক্ষার ফলে খাসিয়াদের আর্থ-সামাজিক কাঠামোই বদলে গেছে। খ্রিষ্টান খাসিয়ারা প্রোটেস্ট্যান্ট এদের মধ্যে ক্যাথলিক আদপেই নেই। খাসিয়া ভাষা অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষার অন্তর্ভূক্ত। বর্তমানে খাসিয়া ভাষা

সীমান্তের ওপারে রোমান হরফে লেখা হচ্ছে। ইদানিং কালে খ্রিষ্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টায় সাঁওতাল লিপির বর্ণমালাও রোমান হরফে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে (বাংলাপিডিয়া,-২খন্ড, পৃ.১০,১২; ৩খন্ড, ৭৯-৮৯)।

আমাদের সীমান্তের ওপারে সেভেন সিস্টার নামে খ্যাত মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, হিমাচল, অরুনাচল প্রভৃতি পাহাড়ী অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এখন ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান। ঐ সব পাহাড়ী অঞ্চল সংলগ্ন বাংলাদেশের র্পাবত্য এলাকায়ও ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য হারে খ্রীষ্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। গড়ে উঠেছে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সুদৃশ্য গীর্জা ও মিশনারী স্কুল। সাম্প্রতিক আঞ্চলিক, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ঘটনাপ্রবাহ এ কথার ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, একদিন চট্টগ্রামের র্পাবত্য অঞ্চল দক্ষিণ সুদান ও ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমূরের মত জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে স্বাধীনতা লাভ করবে। গড়ে উঠবে বাংলাদেশের বুকে আরেকটি স্বাধীনদেশ। খ্রিষ্টান অধ্যুষিত ইউরোপীয় দাতাগোষ্ঠী ও এনজিও চক্র পার্বত্য চট্টগ্রামকে টার্গেট করে সামনে এগুচ্ছে। প্রায় দু’বছর স্থগিত থাকার পর জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (UNDP) এই বছর রাঙামাটি, বিলাইছড়ি, বান্দরবান ও থানচিতে ২০ লাখ মার্কিন ডলারের ‘কমিউনিটি উন্নয়ন কর্মসূচী’ নামক প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। ২০০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে তিন বিদেশী নাগরিককে (ব্রিটিশ ও ডেনিশ) অপহরণের পর বিদেশী সংস্থাগুলো তাদের তৎপরতা সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা উন্নয়নের নামে দেদার বৈদেশিক অর্থের দ্বারা নব দীক্ষিত খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসনের কাজে লিপ্ত রয়েছে। কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের প্ল্যানের অধীনে তারা ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান যুবকদের উচ্চ শিক্ষার জন্য যুক্তরাজ্য, যুক্তরাস্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশে প্রেরণ করে।

পরিস্থিতি এই ভাবে অব্যাহত থাকলে গোটা পার্বত্য অঞ্চলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সচ্ছল এবং রাজনৈতিক দিয়ে বিপজ্জনক খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠী গড়ে উঠবে। এই পাড়ের পাহাড়ীয় খ্রিষ্টানগণ সীমান্তবর্তী ওই পাড়ের পার্বত্যাঞ্চলে বসবাসরত নব দীক্ষিত খ্রিষ্টানদের সাথে মিলে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন পরিচালনা করতে পারে। এই আশংকা অমূলক নয়। NGO তথা বেসরকারী সংস্থা গুলো কোন দেশের কোন সরকারের বন্ধু নয়। এনজিও’রা তাদের খ্রিষ্টান দাতাগোষ্ঠীর গোপন পরিকল্পনাই বাস্তবায়ন করে থাকে মাত্র।(তারীখে পাকিস্তান ও সিন্ধু সেকেন্ডারী স্কুল পরীক্ষা-১৯৬২ ইং, পৃঃ ৫০৪; দৈনিক আজাদ, ঢাকা, উর্দু পত্রিকার মতামত শীর্ষক নিবন্ধ,৩০ জৈষ্ঠ, ১৩৭৪ বাংলা)।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মিশনারি কার্যক্রম

পৃথিবীর যেখানে মিশনারি স্কুল আছে, সেখানে গির্জা আছে। গির্জা ছাড়া পৃথিবীর কোথাও তাদের স্কুল, কলেজ গড়ে ওঠেনি। এমনকি লন্ডন ইউনিভার্সিটি ও নয়। তার পাশে রয়েছে ভেস্টিয়ান ক্রিশ্চিয়ান চার্চ। কিন্তু আমরা মুসলমানরা যদি স্কুল কলেজ ভার্সিটির পাশে মসজিদ বানাতে চাই তখন আমাদেরকে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়। নটরডেম কিংবা মোহাম্মদ আসাদ গেট মিশনারি স্কুল তার পাশেই রয়েছে একটি করে গির্জা।এই স্কুল কলেজগুলোতে যদি একটি স্টুডেন্ট কে মেট্রিক বা ইন্টারমিডিয়েট পড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে সে মুসলিম হয়েও তাদের মিশনারি কার্যক্রমের বিরুদ্ধে একটি টু শব্দ করবেনা।

দৈনিক নয়া দিগন্তের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, নীলফামারীতে আরো পাঁচটি সংগঠন রয়েছে যারা ধর্মান্তরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা তাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে যিশুখ্রিস্টের বই, যীশু খ্রীষ্টের জীবনী ইত্যাদি পড়ান।ছোটদেরকে "সিবগাতুল্লাহ" নামে একটি বই পড়ানো হয়, যাতে বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করে কচি বাচ্চাদের মগজ ধোলাই করা হয়। সেভেন ডে অ্যাডভেঞ্চারিস্ট এর একটি স্কুলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে 'ইটারি ডে জারির' লেখা "আমার বাইবেলের বন্ধুগণ" পড়ানো হচ্ছে। জার্মান ভিত্তিক মিশন সংগঠনটি বিনামূল্যে বইখাতা পোশাক এমন কি দুপুরের খাবার সহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ধর্মান্তরিতকরণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

মিশনারী স্কুলগুলোতে ছোট বাচ্চাদেরকে শিখানো হয় খাবার খেতে হবে প্রভুর নামে। প্রভু বলতে তারা যীশুর নামেই খাবার খাওয়া শুরু করে। এই হলো মুসলিম বাচ্চাদের অবস্থা। যারা বাহ্যিকভাবে মুসলিম হলেও আকিদা বিশ্বাসে তারা খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী। এসব বিষয়ে আমাদের মুসলিমদের অতীব সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। মুসলিম সন্তান হিসেবে মিশনারি স্কুলগুলোতে শিক্ষাধীন শিশুরা জানে না তাদের নবীর নাম, কে তাদের প্রভু। তারা তারা চেনে মেরি এবং যীশুকে। মিশনারি স্কুলের শিক্ষকরা তাদেরকে তাই শিক্ষা দেন। এটাই হলো খ্রিষ্টান মিশনারীদের সেবার আসল রূপ। কোমলমতি শিশুরা বাংলা ইংলিশ অংকের পাশাপাশি পড়ে মুসলিম বাইবেল। মুসলিম বাইবেলে পড়ানো হয় গান। গানটি কিছুটা এরূপ-

যীশু আমার সঙ্গে
আমিও তার সঙ্গে
প্রতি পথে পথে যিশু আমার সঙ্গে
তিনি আমাকে প্রেম করেন
তিনি আমাকে রক্ষা করেন....

এভাবে দেশের আনাচে-কানাচে অনেক জায়গায় স্কুলগুলোতে শিশুদের কচি মনে তাদেরকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করা হচ্ছে । আমরা তো টেরও পাচ্ছিনা। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন, আমাদের মুসলিম ভাই বোনদের রক্ষা করুন।

মিশনারি স্কুলগুলোতে পড়াশোনায় সরঞ্জামাদে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়, থাকে দুপুরে ফ্রিতে খাবার সুযোগ সুবিধা, বাবা মাকে দেওয়া হয় বিনাসুদে ঋণ, মাঝেমধ্যে আর্থিক ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা হয় এমন কি কখনো কখনো চাল ডালের ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়। এতসব সুযোগ-সুবিধার পরে একজন সাধারন মুসলিম হিসেবে তারা যখন দেখে বাচ্চাদের পড়াশোনা ভালো হচ্ছে, আমরা পাচ্ছি এত সুযোগ সুবিধা তখন আসলে তারা ধর্মের ব্যাপারটাকে গৌণ হিসেবেই দেখে। হায় আফসোস!

সমিতি ও সভায় ধর্মপ্রচার

খ্রিস্টান মিশনারি গুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামে গঞ্জে পুরুষ মহিলাদের নিয়ে সমিতি গড়ে তুলেছে। আর সেই সমিতির সদস্যদের পড়ানো হচ্ছে বাইবেল। বিভিন্ন সিডি প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে যীশু খ্রিস্টের জীবনী মূলক চলচ্চিত্র। তাদেরকে পড়ানো হয় ইঞ্জিন শরীফ নামে বাইবেল। লুকের লেখা 'হযরত ঈসা মসী' এবং 'মুসলমানরাও হিন্দুরা ১০০ ভাগ জাহান্নামী ও খ্রিস্টানরা ১০০ ভাগ জান্নাতি' সহ আরো কত বিচিত্র বই। রাতের আঁধারে শিশু মহিলাদের দেখানো হয় বিভিন্ন সিডি। 'আবাগে' নামে একটি সমিতিতে সপ্তাহে দুই টাকা জমা নেওয়া হয় এই বলে যে যখন এক হাজার টাকা জমা হবে তখন তাদেরকে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এরকম লোভ দেখিয়ে তারা দারিদ্রদেরকে হাত করছে। ইভানজেলিক্যাল ফ্রেন্ডস চার্চ ও খ্রিস্টান লাইফ অফ বাংলাদেশ (সি,এল, বি)র ইউনিয়ন ইনচার্জ নতুন রায়ের ভাষ্যমতে, ১২ ই জুন ৪৫ জন মুসলমান এবং ১৩ ই জুন ৫৬ জন হিন্দু কে শিশাতলী গির্জা নিয়ে খ্রিস্টান বানানো হয়েছে।

খ্রিস্টানরা প্রার্থনা সভার নামে মানুষকে ধর্মান্তরিত করে। তাদের নিয়ম হলো কোন এলাকায় প্রার্থনা সভা করলে, তার জন্য পোস্টারিং করবে। সেখানে সকল ধর্মের লোকজনকে আহ্বান জানানো হবে। সাথে থাকে প্রার্থনা সবাই অংশগ্রহণকারীর বিভিন্ন ধরনের রোগ মুক্তির প্রতিশ্রুতি। এখানে তারা কৌশল অবলম্বন করে, যখন তাদের বক্তারা ধর্ম প্রচারের আলোচনার পর বলে, যীশুর নামে প্রার্থনা করলে এই রোগ ভালো হয়। তখন উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্য করে বলে আপনাদের মধ্যে কারো কিছু নামে প্রার্থনা করে কোন রোগ ভালো হয়েছে? তাদের কিছু দালালরা সেখানে শ্রোতাবেসে উপস্থিত থাকে। তারা সভাস্থল থেকে হাত উঠায়, তাদেরকে স্টেজে ডেকে আনা হয়। তারা জনসমক্ষে বলে আমার এই রোগ হয়েছিল ওই রোগ হয়েছিল অনেক চিকিৎসা করেছি, কিন্তু কোন লাভ হয়নি। শেষে এই সভায় যিশুর কাছে প্রার্থনা করার পর আমার রোগ ভালো হয়েছে। এরপর উপস্থিত বক্তা সবার উদ্দেশ্যে বলে চলুন আমরা এবার

সকলে মিলে যীশুর কাছে প্রার্থনা শুরু করি। এরপর সভায় উপস্থিত মুসলিম অমুসলিম সকলে মিলে যীশুর কাছে প্রার্থনা শুরু করে। এভাবে তারা মানুষকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُوا۟ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا۟ لَهُۥ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ

সূরা হাজ্জ: ৭৩

হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে। মনোযোগ দিয়ে শোন। তোমরা দু'আর জন্য আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে ডাক, তারা একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না, যদিও এ কাজের জন্য তারা সকলে একত্র হয়ে যায়। এমনকি মাছি যদি তাদের থেকে কোন জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তাও তারা তার থেকে উদ্ধার করতে পারে না। এরূপ দু'আকারীও বড় দুর্বল এবং যার কাছে দু'আ করা হয় সেও।

প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করার পর খোঁজ নেয় না মিশনারী

ভালোভাবে বেঁচে থাকার আশায় ধর্মান্তরিত হওয়া ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগনের একটি বড় অংশ দুর্দশার মধ্যে পড়েছে। নিয়মিত আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দিয়ে ধর্মান্তর করার কিছু দিন পর অর্থ প্রদান বন্ধ করে দেওয়া এবং খ্রিস্ট ধর্ম শুদ্ধভাবে পালনে চাপ দেওয়ার কারণেই তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে।

জাতীয় আদিবাসী পরিষদ ও আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থার হিসাবে, দেশের প্রায় ৩০ লাখ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অর্ধেকের বাস উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলায়। জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ সরেন ও আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ভাগবত টুডু জানান, উত্তরাঞ্চলের ১৫ লাখ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে ছয় লাখেরও বেশি এরই মধ্যে ধর্মান্তরিত হয়েছে। এ অঞ্চলের আড়াই লাখ সাঁওতালের মধ্যে দুই লাখই তাদের নিজ ধর্ম 'সর্বপ্রাণবাদ' ছেড়ে খ্রিস্টান হয়েছে। এদের মধ্যে অতিদরিদ্র সাঁওতালদের সংখ্যাই বেশি। ধর্মান্তরিত অন্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে রয়েছে ওঁরাও, মাহালি, মুণ্ডা, মালপাহাড়ি, মালো, কোচ, পালিয়া ও রাজবংশী।

রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ আঞ্চলিক ব্যাপ্টিস্ট চার্চ সংঘের পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত রেভারেন জোনা মুর্মু জানান, ধর্মান্তরে ইচ্ছুকদের প্রথমে সাদা কাগজে আবেদন করে পরে আদালতে এফিডেভিটের মাধ্যমে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হতে হয়। রাজশাহীর তানোর উপজেলার মণ্ডুমালার রোমান ক্যাথলিক সাধু জন মেরি ভিয়ান্নি গির্জার ফাদার নির্মল কস্তা দাবি করেন,

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে তাঁরা কোনো প্রলোভন দেখান না। ইচ্ছে করেই অনেকে ধর্মান্তরিত হয়।

‘কোনো প্রলোভন দেখানো হয় না’

রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ আঞ্চলিক ব্যাপ্টিস্ট চার্চ সংঘের পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত রেভারেন জোনা মুর্মু জানান, তানোর উপজেলায় ধর্ম প্রচার ও পালনের জন্য ২১টি গির্জা রয়েছে। এগুলোর আওতায় বিভিন্ন ধর্ম থেকে এরই মধ্যে এক হাজার ৩০০ ব্যক্তি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে। এটি কোনো বিদেশি নয়, দেশি মিশন। তিনি জানান, ধর্মান্তরে ইচ্ছুকরা প্রথমে সাদা কাগজে আবেদন করেন এবং পরবর্তী সময়ে আদালতে এফিডেভিটের মাধ্যমে তাঁদের খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হতে হয়। রাজশাহীর তানোর উপজেলার মণ্ডুমালার রোমান ক্যাথলিক সাধু জন মেরি ভিয়ান্নি গির্জার ফাদার নির্মল কস্তা দাবি করেন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে তাঁরা কোনো প্রলোভন দেখান না। স্বেচ্ছায় অনেকে ধর্মান্তরিত হন। রাজশাহী বাগানপাড়া চার্চের (ব্যাপ্টিস্ট) ফাদার পাওলো খিচেরি বলেন, ‘আমরা কাউকে জোর করে ধর্মান্তরিত করি না। আমরা নিপীড়িত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সেবা দিয়ে থাকি। তারা আমাদের সেবায় মুগ্ধ হয়ে ধর্ম গ্রহণ করে।’ তিনি আরো বলেন, ‘আমি ব্যাপ্টিস্ট মিশনে ৩৬ বছর ধরে কাজ করছি। আর ২২ বছর ধরে রাজশাহীর দায়িত্বে আছি। এ সময়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণ খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে।’

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ভিন্ন কথা

কিন্তু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মুখে শোনা গেছে ভিন্ন কথা। তানোর উপজেলার পাঁচন্দর ইউনিয়নের কচুয়া গ্রামের নরেশ মুর্মু অভিযোগ করে বলেন, ‘ফেলোশিপ চার্চের মিশনারিদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আর্থিকসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আশায় পাঁচ বছর আগে আদি সাঁওতাল থেকে আমি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করি। ওই সময় মিশনারিরা আমার ছেলেমেয়েদের বিনা খরচে লেখাপড়ার সুযোগ দেওয়ার কথা বললেও এখন এ খাতে আমাদেরই মোটা অঙ্কের অর্থ ব্যয় হয়। তাঁদের কথামতো ধর্মাচার পালন ও ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে হচ্ছে। চার্চের ধর্ম প্রচারকরা আমাদের সাঁওতালি আদি প্রথা ঢোল, মাদল বাজানো ও সাঁওতালি ভাষায় গান করা নিষেধ করে দিয়েছেন। এমনকি প্রতিবেশী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সঙ্গে মেশামিশিতে সতর্ক করে দিচ্ছেন।’ জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত অনিল মারাণ্ডি অনুতাপের সুরে বলেন, ‘না বুঝে ও লোভে পড়ে বাপ-দাদার আদি ধর্ম ত্যাগ করে বড় ভুল করেছি। এখন প্রতি মুহূর্তেই অনুশোচনা বোধ করি। আদি ধর্ম ও সত্তা বিলীন হওয়ায় আমার মতো অনেকেই আজ মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে।’ তিনি আদি ধর্ম ও সংস্কৃতিতে ফিরে আসার চেষ্টা করছেন বলেও জানান।

ভুক্তভোগীরা যা বলেন

কয়েক বছর আগে ধর্মান্তরিত তানোরের কচুয়া গ্রামের বিশ্বনাথ হেমরম ও জামিন মারাণ্ডি জানান, তাঁরা এখনো সাঁওতালি প্রথার আদলেই খ্রিস্ট ধর্ম পালনের চেষ্টা করছেন। কিন্তু চার্চের লোকজন নাখোশ হয়েছে। তারা এতে বাধা দিয়েছে, একঘরে করে রাখার ঘোষণাও দিয়েছে। একই গ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী গ্রামপ্রধান রমেশ হাসদা ও দুরবিন কিসকু বলেন, সাঁওতালরা খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করলেও তারা প্রাচীন ধর্মাচার, চিরায়ত প্রথা-উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বাদ্য, বাঁশি, মাদল, তীর-ধনুক, সরাই, দুল বাজাতে চায়। কিন্তু তা নিষেধ করা হচ্ছে বলে শুনেছি।

রমেশ হাসদা বলেন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রতি গ্রামে সাত সদস্যের একটি করে পরিচালনা কমিটি (বিচারিক) থাকলেও এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন মিশনারিরা। এমনকি নতুন খ্রিস্টানদের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কমিটির বিচার অমান্য করতেও বলা হচ্ছে। এটা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা মেনে নিতে পারছে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে নব্য খ্রিস্টানদের সঙ্গে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের দূরত্ব না কমলে সংঘাতের আশঙ্কা আছে। এরই মধ্যে খ্রিস্টান ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে শ্রেণীগত বৈষম্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার সুফল হাসদা ও জয়পুরহাটের পাঁচবিবির কামিনী মুর্মু বলেন, 'খ্রিস্টান হলে প্রতি মাসে ৫০০ থেকে দুই হাজার টাকা পর্যন্ত পাওয়ার আশায় এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ধর্মান্তরিত হয়েছে। তবে প্রথম দুই-এক মাসে কিছু অর্থ পাওয়া গেলেও এখন কিছুই না পাওয়ায় আমরা হতাশ। অনেকেই এখন প্রাচীন ধর্মে ফিরতে আগ্রহী হয়ে উঠছে।'

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর জেলায় ১৮৮০ সালে ব্যাপ্টিস্ট মিশনের কাজ প্রথম শুরু হয়। এ মিশনের প্রধান জেন এন দত্ত ১৯০৭ সালে প্রথম চেষ্টায় ২৩ জন সাঁওতালকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করেন। এরপর থেকে এ প্রক্রিয়া চলে আসছে। যখন থেকে শুরু কয়েকটি নৃতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে জানা যায়, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ধর্মান্তর করতে উত্তরাঞ্চলের ১৯টি ব্যাপ্টিস্ট মিশনের ৩৫৮টি শাখা কাজ করে যাচ্ছে। ধর্মান্তর কর্মসূচিতে মিশনারি সহায়তাপুষ্ট আরো ১৫৭টি বেসরকারি সংস্থা পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করছে। এরমধ্যে রাজশাহী অঞ্চলে কাজ করছে সাতটি। রোমের ভ্যাটিকান থেকে ১৯৯০ সালের ৯ জুন রাজশাহীকে ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের 'ষষ্ঠ ধর্মপ্রদেশ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সেই থেকে এ অঞ্চলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ধর্মান্তরের কাজ আরো জোরদার হয়।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক সমন্বয়ক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষক ড. আজিজুল হক বলেন, উত্তরাঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে ৬০ ভাগই সাঁওতাল। অভাবের তাড়নায় জমি-ভিটা হারিয়ে অনেকেই নিঃস্ব, সহায়-সম্বলহীন। পরিবার-পরিজন নিয়ে গায়ে-গতরে খেটেও তারা ক্ষুধা ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারছে না। ফলে সামান্য অর্থের প্রলোভনেই তারা নিজ ধর্ম ছেড়ে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে।

ইসলামের আদর্শ তুলে ধরুন : পেশ ইমাম

ধর্মান্তরের বিষয়ে কোনোরকমের প্রতিহিংসামূলক আচরণে না গিয়ে সবার সামনে ইসলামের মূল আদর্শ তুলে ধরার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের পেশ ইমাম মুফতি মুহাম্মদ মুহিবুল্লাহিল বাকি। বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম। এটিই হচ্ছে সমস্যা সমাধানের, সংকট থেকে উত্তরণের সর্বোত্তম দিকনির্দেশিকা। ইসলাম কোনো সমস্যা তৈরিকে সমর্থন করে না। কারো প্রতি প্রতিহিংসামূলক মনোভাব কিংবা আচরণ ইসলামের দৃষ্টিতে কাম্য নয় মন্তব্য করে তিনি বলেন, দেশের উত্তরাঞ্চলসহ বিভিন্ন স্থানে খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্ম প্রচার বা ধর্মান্তরের বিষয়টি তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিতে হয়তো সঠিক কাজ। এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের ব্যর্থতা হচ্ছে, তারা তাদের কাজ ঠিকমতো করছে না। তিনি বলেন, 'উত্তরাঞ্চলে সাঁওতাল ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মান্তরে খ্রিস্টান মিশনারির তৎপরতা অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে ইসলামের মর্মবাণী পৌঁছাতে আমাদের ব্যর্থতা প্রমাণ করলেও তার বিপরীতে কোনো হিংসাত্মক মনোভাব সৃষ্টি ইসলাম কোনোভাবেই সমর্থন করে না। সেটা হলে অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ইসলামের প্রতি আরো বিরূপ মনোভাব তৈরি হবে। এটা আমাদের কাম্য নয়। আমাদের উচিত সবার কাছে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা, যাতে অন্য ধর্মাবলম্বীরাও ইসলামের পথে আসে।'

সূত্র: কালের কণ্ঠ, ২০ জানুয়ারি, ২০১০ ও সিএইচটি রিসার্চ ফাউন্ডেশন আর্কাইভ।

উত্তরবঙ্গে খ্রিস্টান মিশনারী অপতৎপরতা

যেভাবে কার্যক্রম চালায় উত্তরবঙ্গে : বৃহত্তর রংপুর বিভাগের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে।অভাব তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। এই অভাবকে মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ধরে খৃস্টান মিশনারীরা বিভিন্ন পলিসি গ্রহণ করে। যেমন: ক. নিরক্ষর মানুষদেরকে ঋণসুবিধা,ঘুর্ণিঝড় ইত্যাদিতে আশ্রয়দান, হাসপাতালে ফ্রী চিকিৎসাসেবা ও তাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে অবৈতনিক পাঠদানের সুযোগের ফাঁদে ফেলে মূলতঃ তাদেরকে খৃস্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করে ,অন্যথায় এই সমস্ত ফ্রী সুযোগের টাকা দাবী করে। খ. শিক্ষিত দরিদ্র বেকারদেরকে তাদের প্রতিষ্ঠানে চাকরির প্রলোভন ও বিদেশে উন্নত পড়াশোনার টোপ দিয়ে তাদের মাঝে খৃস্টধর্ম প্রচার করে। গ. সরলমনা মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা ইংল্যা- থেকে খৃস্টান ইমাম-খতীব প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়ে আসে। যাদের কাজ হলো, কুরআন-সুন্নাহের অপব্যাখ্যা করে মানুষের মাঝে সন্দেহের বীজ বপন করা। চট্টগ্রাম ও দিনাজপুরের ১৩ টি মসজিদের ইমাম এমন পাওয়া গেছে, যারা মুসলমান নয়। খৃস্টান মিশনারীদের চর ও এজেন্ট। অহরহ এমন সংবাদ পত্রিকার পাতায় পাওয়া যাচ্ছে। ঘ. কিছু অসাদু রাজনৈতিক নেতা ও সমাজের বখাটে শ্রেণীর মাধ্যমে। যারা সামাজিক অপকর্মে লিপ্ত, তাদেরকে মাদক -ইয়াবা ও রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে খৃস্টধর্ম প্রচার করে। যেমন- কুড়িগ্রাম সদরের এক এলাকার ব্যাপারে জানা যায়, সেখানে ৪০জনের একটি টিম ছিল ; যারা মাদকসেবী হিসেবে পরিচিত ও মুসলমান ছিল। স্থানীয় প্রশাসন রাষ্ট্রীয় নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার্থে সেখানে অভিযান পরিচালনা করলে তারা 'ধর্ম পরিবর্তনের' কথা বলে নিজেদেরকে খৃস্টান হিসেবে পরিচয় দেয় এবং মাদক খৃস্টধর্মে বৈধ বলে তা প্রকাশ্যে পান করে । ফলে প্রশাসন নির্বিকার থাকে এবং রাষ্ট্রীয় নিয়মশৃংখলা ব্যাহত হয়।

কি হচ্ছে কুড়িগ্রামের চরে? : চরাঞ্চল এলাকা কুড়িগ্রাম। এ জেলাতে প্রায় ৪১০ টি চর আছে। তার মধ্যে ২০২ টি চরে মানুষের বসবাস। এই চরকেন্দ্রীক চলছে খৃস্টান মিশনারীদের সেবার আড়ালে খৃস্টধর্মের রমরমা প্রচারণা।ফুলবাড়ী থানার গোরকমন্ডল এলাকার একটি চর মিশনারীদের দখলে।সেখানে ৩৯টি পরিবার একসঙ্গে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছে। উলিপুর থানার মিনাবাজার এলাকায় ৪৫ একর জমি এবং চিলমারী থানার বালাবাড়ীতে ৬০ বিঘা জমি নিয়ে গীর্জা - স্কুল ও খামার তৈরী এবং ভিতরে গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা করেছে। ভুরঙ্গমারীতে প্রায় শতাধিক এবং একই থানার ভোট হাট ইউনিয়নে ২৫-২৬ পরিবারকে আহলে কুরআনের অন্তরালে খৃস্টান বানিয়েছে। কুড়িগ্রামে প্রায় ১৬ হাজার খৃস্টান রয়েছে। এই জেলাতে তাদের ২০ টির মত গীর্জা, ১৫ টি মিনি স্কুল, ৫টি হাইস্কুল, ৭টি ব্যাপটিস্ট কেন্দ এবং ২০ টির অধিক বিভিন্ন্ এনজিও সংস্থা রয়েছে।(রহমত নিউজ,মুফতি জসিম উদ্দিন, ১৮ আগস্ট, ২০২২)

খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারক

মাদার তেরেসা

তিনি অবিবাহিত ছিলেন। বাংলাদেশ পশ্চিমবাংলায় তার প্রতিষ্ঠিত ৩০০ টি এতিম খানা রয়েছে। মাদার তেরেসার এক বড় টার্গেট ছিল ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি খ্রিস্টান রাষ্ট্রে পরিণত করা। মাদার তেরেসার মত এরকম অনেক খ্রিস্টধর্ম প্রচারক পরের পর বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে পাহাড়ের গুহায় থেকে ধর্ম প্রচার করে গেছেন। ইসলাম ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে আমরা ধর্ম প্রচারকদেরকে যেরকম নিবেদিত প্রাণ দেখেছি খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারকদের প্রচেষ্টা তার চেয়ে বেশি না হলেও কম ছিল না। আমরা আমাদের ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারিনি ঠিকই কিন্তু খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকরা তাদের প্রচেষ্টা ঠিকই অব্যাহত রেখেছেন। যা মুসলিম হিসেবে আমাদের জন্য চরম হতাশার। সেবার বিনিময়ে তাদের আসল উদ্দেশ্য রাস্তায় পথে ঘাটে পড়ে থাকা শিশু এবং জারজ শিশুদের তুলে এনে তাদের সেন্টারে নিয়ে যায়। সেখানে তাদেরকে পড়াশুনায় শিক্ষিত করার মাধ্যমে যারা পড়াশুনায় মেধাবী হয় তাদেরকে দক্ষ করে তুলে এনে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পাইলট সেনাবাহিনী ইত্যাদি বানায়। খ্রিস্টানদের প্রয়োজনে তাদেরকে ব্যবহার করে। খ্রিস্টানদের স্বার্থে তাদেরকে বিভিন্ন মিশনে পাঠায়। সেসব মিশনে তাদের কোন ক্ষয়ক্ষতিতে তাদের কোন ওয়ারিশ থাকেনা। খোঁজ নেওয়ার লোক থাকে না। সেবার আড়ালে এসবই তাদের উদ্দেশ্য।

কিছু খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকঃ

ফাদার এনজো কর্বা, গিমে

তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম প্রচার করেছেন। ১৯৫৮-১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ঠাঁকুরগায়ের সদর থানার রুহিয়া গ্রামে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করেন।সেখানে তিনি স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষাও শিখে নিয়েছেন। ১৯৬০-১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বনপাড়ায় খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করেন। ১৯৬২-১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বেনি দুয়ায় খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করেন। দিনাজপুর জেলার শুইহারিতে ১৯৬৫ থেকে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন বরিশালের গৌরনদীর রাজপুরে। এরপর তিনি সাময়িক সময়ের জন্য ফিলিপাইনে পাড়ি জমান এবং আবার বাংলাদেশে ফিরে আসেন। দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ থানার বটতলীর পাশে সিংড়া ফরেস্টে ১৯৯৭ থেকে ২০১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করেন।

ফাদার মারিয়ানো পনইজনিব্বি, পিমে

তার জন্ম ইতালিতে। বাংলাদেশে আসেন ধর্ম প্রচারের কাজে। তার পুরো জীবন ধর্ম প্রচারের কাজেই ব্যয় করেন ।

ফাদার কার্লো কালাঙ্কি, পিমে

১৯৫৮ থেকে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ থানার নিচপাড়া এলাকায় ধর্ম প্রচার করেন।এর পর তিনি ১৯৬৮ থেকে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঠাকুরগাঁয়ে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করেন। চলে যান ইতালির রোমে সেখান থেকে ফিরে ১৯৭৭ থেকে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন দিনাজপুর জেলায়। শেষ তিনি দিনাজপুর জেলায় ২০১৩সালে মারা যান।

ডাঃ রেমো বুকারী, জেভেরিয়ান মিশনারি ব্রাদার

তার জন্মও ইতালিতে তিনি জীবনের ৪৮ টি বছর কাটিয়েছেন যশোরের ফাতিমা হাসপাতালে। সেখানে মানুষকে চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন আর এই চিকিৎসা সেবার আড়ালে দাওয়াত দিয়েছেন অসংখ্য মানুষকে।

مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ح و حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ ثَلاَثًا أَوْ قَوْلُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ

আবূ বাক্‌রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, নবী (সাল্লালাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সবচেয়ে কঠিন কবীরা গুনাহ্‌ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। মিথ্যা সাক্ষ্য কথাটি তিনবার বললেন। অথবা বলেছেন; মিথ্যা বক্তব্য। কথাটি বারবার বলতে থাকলেন, এমন কি আমরা আকাঙ্ক্ষা করতে লাগলাম, হায় যদি তিনি নীরব হয়ে যেতেন।(আধুনিক প্রকাশনী- , ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৪৫১)

সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬৯১৯

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

খৃষ্টান বানানোর অপকৌশল

বহুকাল থেকে তারা তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অনেক সম্মেলন করেছে। এমন কি বর্তমানেও তাদের মিশনে উক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীগণ দূত হিসেবে তাদের নিকট কৌশলসমূহের কার্যকারিতা, তাদের প্রভাব, তাদের সফলতা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মত-বিনিময় ও প্রস্তাব নিয়ে একত্রিত হয়। আর এজন্য তারা সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করে সামনে অগ্রসর হচ্ছে।

তাদের অপকৌশলসমূহ নিম্নরূপ:

মুসলিম বিশ্বে খ্রিস্টান মিশনারী গোষ্ঠী প্রেরণ এবং খ্রিস্টবাদের দিকে আহ্বান জানানো: এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা নিম্নোক্ত কর্মসূচীসমূহ গ্রহণ করেছে:
খ্রিস্টান ধর্মের পরিচিতিমূলক বিভিন্ন বই, বিজ্ঞাপন ও লিফলেট বিতরণ।
বিকৃত ইঞ্জিলের অনুবাদ প্রচার ও প্রসার।
ইসলামের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টিকারী ও আক্রমণাত্মক প্রচারপত্র বিলি করা।
এবং বিশ্বের দরবারে ইসলামের বিকৃতিমূলক নানা দিক তুলে ধরা।
অতঃপর তারা কতিপয় মোড়ক আবৃত ও বক্র-কুটিল পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে অতিসূক্ষ্ম পন্থায় লোকদেরকে তাদের ধর্মে দীক্ষিত করার পদক্ষেপ নিয়েছে। তাদের এসব মারাত্মক কিছু পদ্ধতি নিম্নরূপ:
চিকিৎসা সেবা ও জনসাধারণকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান: মুসলিম সমাজে ব্যাপকহারে রোগ-ব্যাধি বিস্তার সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় মুসলিম ডাক্তারের স্বল্পতা এমনকি কোনো কোনো স্থানে না থাকার সুবাদে চিকিৎসার চাহিদা তাদের এই পদ্ধতি প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

সাধারণ শিক্ষার অন্তরালে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার: কোথাও কোথোও সরাসরি খ্রিস্টান স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার মাধ্যমে তাদের এই অপতৎপরতা চলছে। আবার কোথাও কোথাও বাহ্যিক দৃষ্টিতে সবার জন্য সাধারণ শিক্ষা নাম দিয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে, যার অন্তরালে রয়েছে তাদেরকে খ্রিস্টান বানানোর গোপণ ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা। আর তাদের পাতানো উক্ত জালে বড় অংকের মুসলিম জনগোষ্ঠী পতিত হয়েছে, বিদেশী ভাষা বা বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের লোভে ছেলে-মেয়েদেরকে তাদের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করছে। এর পরিণতিতে দেখা যায় এ মুসলিম জাতি, তাদের তাজা মস্তিষ্কসম্পন্ন, যাদের মগজ বর্তমানে সব ধরনের জ্ঞানার্জনের জন্য উন্মুক্ত, সে সব কলিজার টুকরা শিশু কিশোরদেরকে খ্রিস্টানদের হাতে হাদিয়া হিসেবে প্রদান করেছে চলেছে!! আর খ্রিস্টানরা যা-ই তাদেরকে প্রদান করছে এ বাচ্ছারা তা-ই নির্দ্বিধায় গ্রহণ করছে!!

তথ্য ও প্রচার মাধ্যমে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচার: খ্রিস্টান মিশনারীদের খ্রিস্টান বানানোর অন্যতম কৌশল হচ্ছে, তথ্য ও প্রচার মাধ্যমের ব্যবহার। মুসলিম বিশ্বের দিকে তাক করা রয়েছে তাদের বহু রেডিও চ্যানেল। তাছাড়া পরবর্তী কয়েক বছরে তারা শত শত টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে তুলে ধরছে তাদের বিকৃত ধর্ম ও তার প্রোগ্রামসমূহ।
এছাড়া সংবাদ পত্র, পত্র-পত্রিকা এবং তাদের অসংখ্য প্রকাশনা, প্রচারণাও এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। তাদের উক্ত দর্শনীয়, শ্রুত ও পঠিতব্য সম্প্রচার মাধ্যমগুলো খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের চাকাকে বিভিন্ন ভাবে সামনে এগিয়ে দিয়েছে, যেমন:

(ক) তারা ঐসব সম্প্রচার মাধ্যমগুলোর দ্বারা খ্রিস্টান ধর্মের তথাকথিত বানানো বৈশিষ্ট্যের প্রচার করছে। তারা বিশ্বের সকলের জন্য খ্রিস্টান ধর্মে দয়া, ভালোবাসা ইত্যাদি রয়েছে বলে মিথ্যা তথ্য প্রচার-প্রসার করে তাদের ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

(খ) মুসলিমদের আকীদা-বিশ্বাস, তাদের ধর্মীয় নিদর্শন এবং তাদের পরস্পরের দীনী সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করার মাধ্যমে তাদের বিকৃত খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আহ্বান করছে।

(গ) নগ্নতা, যৌনতা, প্রবৃত্তি উত্তেজক বিবিধ অশ্লীলতা সম্প্রচার করে দর্শকদের নৈতিক চরিত্র ও পবিত্রতা বিনষ্ট করা, লজ্জাহীন বানানো। তাদেরকে প্রবৃত্তি পূজারী ও ক্ষণস্থায়ী আনন্দের মোহে নিপতিত করে ভোগের দাসে পরিণত করা। কেননা তারা এ ধরনের হয়ে গেলে তাদের যে কোনো দাওয়াত বা মিশন তাদের মাঝে সফল হবে। এমনকি মুরতাদ-কাফির হওয়ার ব্যাপারেও তাদের কোনো দ্বিধা থাকবে না। (আল্লাহ আমাদের এ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করুন) তাদের উক্ত মিশন সফল হওয়ার ভিত্তিতে মুসলিমের অন্তর থেকে যখন ঈমানের মূলোৎপাটন হবে এবং আত্মা থেকে ধর্মীয় চেতনার বাঁধ ধ্বংস হয়ে যাবে তখন সহজেই উক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে।

উল্লিখিত খ্রিস্টান তৈরির অপকৌশল ব্যতীত তাদের আরো বহু অপকৌশল রয়েছে, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তা যথার্থভাবে অনুভব করতে পারবেন। আলোচনা সংক্ষেপ করার জন্য সেগুলো বাদ রাখা হয়েছে। কেননা এই অল্প পরিসরে তাদের সবগুলো অপকৌশল বর্ণনা উদ্দেশ্য নয়, বরং তাদের থেকে সতর্ক করাই মূল উদ্দেশ্য। বস্তুত তাদের প্রকৃত অবস্থা তো তা-ই যা মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বিধৃত করেছেন এ বলে যে,

﴿وَيَمۡكُرُونَ وَيَمۡكُرُ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلۡمَٰكِرِينَ ٣٠﴾ [الانفال: ٣٠]

“আর তারা ষড়যন্ত্র করে, আল্লাহও (তাদের ষড়যন্ত্রের বিপরীতে) কৌশল করেন। বস্তুতঃ আল্লাহর কৌশল অতি উত্তম।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩০]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿يُرِيدُونَ أَن يُطۡفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَيَأۡبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٣٢﴾ [التوبة: ٣٢]

“তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতি নির্বাপিত করতে চায়। কাফিরগণ অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণতা বিধান করা ব্যতীত অন্য কিছু চান না।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩২]

অপকৌশল ১ – যশোরে ফাতেমা নামক একটি হাসপাতাল আছে। প্রতিদিন সে হাসপাতালে প্রায় ছয়শত মুসলমান চিকিৎসা নেওয়ার জন্য যায়। আর এ সুযোগে তারা ধর্মান্তরে আকৃষ্ট করার চাতুরীপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করে। জনৈক রোগীর ঘটনা, সে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গেলো। কর্তব্যরত নার্স তাকে তাকে একটি ঔষধের পোটলা দিয়ে বললো, এটা আল্লাহ’র নাম নিয়ে খেয়ো। সরল মহিলা সেবিকার পরামর্শ অনুসারে ঔষধ সেবন করলো বটে, কিন্তু রোগ সারলো না। পরদিন আবার গেলে তাকে আরেকটি ঔষধের পোটলা দিয়ে বললো, যীশুর নামে খেয়ে দেখো সারে কিনা। এবার ঔষধ সেবনে তার রোগ সারলো। (মূলত দ্বিতীয় পর্যায়ে সঠিক ঔষধ দিয়েছিলো) এভাবে প্রহসনের মাধ্যমে দেশের সরলপ্রাণ আত্মভোলা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে মিশনারিরা।

অপকৌশল ২ – খৃষ্টান মিশনারিগুলোর অনুদাননির্ভর এনজিওদের দ্বারা দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হাজার হাজার প্রাথমিক স্কুল। নিরক্ষরতা দূরীকরণ শ্লোগানের আড়ালে সেখানে কোমলমতি শিশুদের মনে খৃষ্টধর্মের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির নিরন্তর প্রয়াস চালানো হচ্ছে। যেমন – খৃষ্টান মিশনারিগুলোর অনুদাননির্ভর একটি এনজিও দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্কুলে জনৈক শিক্ষিকা ছাত্রদের বললেন, বাড়িতে তোমাদের আব্বু-আম্মু তোমাদের বেশী ভালোবাসেন, না তোমাদের বাড়ির সেবকদের (কাজের লোকদের)। উত্তরে কোমলমতি শিশুরা বললো – বাবা-মা আমাদের বেশী ভালোবাসেন। তখন শিক্ষিকা বললেন – তোমাদের বাবা-মা তোমাদের স্নেহ করেন এজন্য যে, তোমরা তাদের সন্তান। তেমনই খৃস্টধর্মের প্রবর্তক যীশু হলেন আল্লাহ’র পুত্র, আর মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন আল্লাহ’র বান্দা ও দাস। এখন বলো, পুত্র হিসেবে আল্লাহ যীশুকে বেশী ভালোবাসেন, না মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘কে ?

অপকৌশল ৩ – খৃষ্টানরা পরিকল্পিতভাবে খৃষ্টধর্মের বর্তমান বিকৃতরূপকে জাগতিক উন্নতি, পরকালের মুক্তির একমাত্র সহজ উপায় হিসেবে উপস্থাপন করছে। তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষের দলীল হিসেবে ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতসমূহকে পেশ করছে। এতে বিভ্রান্ত হচ্ছে আত্মভোলা সহজ-সরল জনগোষ্ঠী, ধর্মান্তরিত হচ্ছে অনেক মানুষ। যাদের ধর্মান্তর করার জন্য টার্গেট করা হয়, তাদের ধারণা দেওয়া হয় যে, পূর্বের নবীদের উপর ঈমান রাখাও ইসলামের মৌলিক বিধান। এক্ষেত্রে ঈমান হিসেবে ঈমানে মুসাসসালের অংশবিশেষ "নবীদের উপর ঈমান আনয়ন" এর আবশ্যকতার প্রসঙ্গটি উপস্থাপন করা হয় অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে। এ ধরেনর প্রচারণার শিকার দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ থানার আমীর হামযা সম্পর্কে জানা যায়, সে নিজেলে ঈসায়ী মুসলমান হিসেবে দাবী করে। তার বক্তব্যের স্বপক্ষে "ঈমানে মুফাসসাল" কালেমার বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করে যুক্তি দেখায় যে, এতে পূর্ববর্তী নবীদের উপর ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে এবং তা আবশ্যক, সে নিরিখে সে ঈসায়ী মুসলমান। এ সব ঘটনা বিশ্লেষণে এ বিষয়টি প্রকাশ পায় যে, ধর্মান্তর ঘটানোর জন্য যে কৌশলেরই প্রয়োজন দেখা দিক, সুচতুরভাবে তা প্রয়োগে তার সদা তৎপর থাকে।

অপকৌশল ৪ – মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার একটি বড় কৌশল হলো, মিশনারিতে ধর্মান্তরিত হলেও নাম রাখে মুসলমানদের, যাতে মুসলমানরা বুঝতে না পারে। যেমন, যশোর জেলায় ফাতেমা হাসপাতাল নামে একটি মিশনারি হাসপাতাল আছে। হাসপাতালের প্রবেশমুখে শ্বেতপাথরে খোদিত সুন্দর একটি সিনারী আঁকা, এতে মাদার তেরেসার সদলবলে একটি সাঁকো পার হওয়ার দৃশ্য। ছবির নিচে সুন্দর করে লেখা – যীশু পীড়িত মানুষকে সেবাদানের জন্য এভাবে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। ছবিটি হাসপাতালের প্রবেশ পথের সামনের দেওয়ালে এমনভাবে সাঁটানো যে, যে কোন দর্শনার্থী ও সেবাগ্রহীতা লোকের নজর কাড়ে। হাসপাতালের গেটম্যানের নাম মুহাম্মাদ সৈয়দ, মূলত এই লোকটি খৃষ্টান। তদ্রূপ হাসপাতালের এম. ডি. ও প্রধান ডাক্তারসহ প্রায় সবাই খৃষ্টান হলেও মুসলিম নাম ধারণ করেছে। যেমন, এম. ডি.র নাম মুহাম্মাদ বোখারী।

এই হাসপাতালের পিছনে একটি গির্জা আছে। গির্জা ও হাসপাতালের মাঝামাঝি একটি পার্ক আছে। এ পার্কে টিলার উপর কৃত্রিমভাবে নির্মিত বিশাল আকারের একটি নারীমূর্তি। এর সামনে কয়েকটি নারীমূর্তির হাঁটু গেঁড়ে প্রণাম করার দৃশ্য। কয়েকটি ভেড়া হা করে চেয়ে আছে বিশাল নারী মূর্তিটির দিকে। এর মধ্যে একটি ভেড়া অলস ঝিমুচ্ছে। রোগী ও দর্শনার্থীরা ঘুরে ঘুরে পার্কে স্থাপিত মূর্তিগুলোর লীলা উপভোগ করছে। রোগীদের একঘেয়েমী দূর ও চিত্ত-বিনোদনের জন্য এ ব্যবস্থা। পার্কে স্থাপিত মূর্তিগুলো দেখলে মনে হয় – এগুলো গির্জার মহিমা ফেরি করে বেড়ানোর জন্য রাখা হয়েছে। সে পার্কে মিশনারির নিযুক্ত লোক দর্শনার্থী ও রোগীদের কাছে মূর্তিগুলোর অবস্থা বিশ্লেষণ করে মেরীর মহিমা প্রচার করে। যেমন,

দর্শনার্থীদের বা রোগীদের বুঝায় যে, টিলার বড় নারী মূর্তিটি হলো মেরী, যাকে মরিয়ম বলা হয়। আর প্রণামরত ছোট ছোট নারী মূর্তিগুলো হলো স্বর্গীয় দূত, যাদেরকে আপনারা ফেরেশতা বলেন। অর্থাৎ, মেরী কোন একসময় পাহাড়ি অঞ্চল দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, তখন স্বর্গীয় দূতেরা তাকে দেখে প্রণাম করছে আর ভেড়াগুলো ঘাস খাওয়া বিরতি দিয়ে মেরীকে দেখছে। একটি ভেড়া বেখেয়ালে ঝিমুচ্ছে। স্থানীয় একজন আলিম জানান, রোগীদের পার্কে ঘুরানোর সময় গির্জার নিযুক্ত লোকেরা চাতুর্যের সাথে মেরীর মূর্তি ও গির্জার প্রতি ভক্তিমূলক ইঙ্গিত-ইশারা করে রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনার প্রসঙ্গ তোলে। আর হাসপাতালের দেওয়ালে সাঁটানো যীশুর ছবি, সাঁকো পার হওয়া সংবলিত আর্ট, গ্রামে গ্রামে ঘুরে যীশুর রোগীসেবা ও সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের রোগীর বেডের আশেপাশে খৃষ্টধর্মের বিভিন্ন বই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা হয়, যেন অবসর সময়ে রোগী নিজ থেকে বই হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করে। এভাবে সেখানে লোকজনকে ধর্মান্তরে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وَلْيَنْتَهِ".

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের কারো নিকট শয়তান আসতে পারে এবং সে বলতে পারে, এ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? ঐ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? এরূপ প্রশ্ন করতে করতে শেষ পর্যন্ত বলে বসবে, তোমাদের প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে? যখন ব্যাপারটি এ স্তরে পৌঁছে যাবে তখন সে যেন অবশ্যই আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায় এবং বিরত হয়ে যায়।

সহিহ বুখারী: ৩২৭৬
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا فَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهَكَذَا رَوَى سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَرَوَى عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الإِيمَانُ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ بَابًا " . قَالَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ঈমানের দরজা (স্তর) হলো সত্তরের অধিক। তার সর্বনিম্ন স্তর হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা এবং সর্বোচ্চ স্তর হলো ‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লা-হ’ বলা।

সহীহঃ সহীহাহ্ (১৩৬৯), বুখারীর বর্ণনায় ষাটের অধিক এবং মুসলিমের বর্ণনায় সত্তরের অধিক উল্লেখ আছে। আর এটাই অগ্রগণ্য। তাখরীজুল ঈমান (২১/৬৭)।

ফুটনোট: আবূ ‘ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ । সুহাইল ইবনু আবী সালিহ (রহঃ) ‘আব্দুল্লাহ ইবনু দীনার হতে, তিনি আবূ সালিহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন । এ হাদীসটি আবূ সালিহ-আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে এই সূত্রে ‘উমারাহ্ ইবনু গাযিয়্যাহ্ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন । তাতে আছেঃ “ঈমানের চৌষট্টিটি দরজা (স্তর) আছে” । এই অর্থে হাদীসটি শাজ । কুতাইবা-বাক্‌র ইবনু মুযার হতে, তিনি ‘উমারাহ্ ইবনু গাযিয়্যাহ্ হতে, তিনি আবূ সালিহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে এই সূত্রে তা বর্ণিত হয়েছে ।

জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৬১৪
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

২০২৫ সাল পর্যন্ত খৃষ্টানদের বিভিন্ন টার্গেট ও পরিকল্পনা

১৯৭৮ সালে উত্তর আমেরিকার লুওয়াজিন নামক স্থানে সমকালীন খৃষ্টবাদ প্রচারের ধারাবাহিকতায় এক ঐতিহাসিক কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। তাতে সারা দুনিয়ার প্রায় দেড়শ প্রথম সারির খৃষ্টান ধর্মগুরু ও ধর্মনেতাগণ যোগদান করেন। তাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন দেশের বড় বড় গির্জা, মিশনারি প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি ছিলেন। উক্ত কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী সবাই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান-গবেষণা এবং বোধ ও বুদ্ধিমত্তার আলোকে বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে মুসলমানদের মাঝে খৃষ্টবাদ প্রচারের স্বার্থে এ ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেন যে, দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার সময় যদি তাৎক্ষণিকভাবে মুসলমানদেরকে খৃষ্টবাদের বিষাক্ত ট্যাবলেট গলধকরণ করানো নাও যায় তাহলে সমস্যা নেই; কিন্তু কমপক্ষে অতি অবশ্যই মুসলমানদের মাঝে নৈতিক ও চারিত্রিক স্খলন ঘটানো এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাদেরকে পঙ্গু করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যেতে হবে। কনফারেন্সে যোগদানকারী ধর্মনেতাগণ এ প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে একটি রিসার্চ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। যা পরবর্তীতে একজন প্রসিদ্ধ উগ্র ও চরমপন্থী খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক স্যামুয়েল জেইমারের নামে পরিচিতি লাভ করে।

মোটকথা, গির্জাপতি আর ধর্মনেতাগণ খৃষ্টধর্ম প্রচার-প্রসারের পথকে সহজ ও সুগম করতে কোন কল্পনা-পরিকল্পনা বাকি রাখেননি। একজন মুসলমানের অমূল্য সম্পদ ঈমানকে ছিনতাই করা, মুসলিম যুবসমাজের চরিত্রকে নষ্ট করা এবং ইসলামবৃক্ষের গোড়াকর্তন করার – সার্বিক অর্থেই যতো পথ ও পন্থা হতে পারে তারা সব আবিস্কার করেছে এবং মুসলমানদেরকে সে অনুযায়ী পরিচালিত করছে। কিন্তু পরিতাপের কথা হলো, মুসলমানরা নিজেদের সঠিক পথ ছেড়ে ইয়াহুদি-খৃষ্টানদের বাতলানো পথে চলতে লজ্জা ও অনুশোচনাবোধ তো দূরের কথা, বরং সেটাকেই গর্ব ও আভিজাত্যের বিষয় মনে করছে। যারা এ ব্যাপারে সামান্য "নাক গলায়", তাদেরকে সেকেলে, চরমপন্থী, প্রগতির পথে বাধা ইত্যাদি নানা বিশেষণে বিশেষায়িত করছে।

একটি রিপোর্ট-

আন্তর্জাতিক খৃষ্টান মিশনারি প্রতিষ্ঠান তার তেরতম বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাতে রয়েছে খৃষ্টান মিশনারিদের অতীত সফলতাসহ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া। চলতি শতাব্দীর প্রথম ২৫ বছরে তাদের কি কি অভিসন্ধি রয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নে কোন পথে এগুতে হবে, কি পরিমাণ অর্থসম্পদ তাতে ব্যয় হবে, কতজন ধর্মপ্রচারক ও মিশনারি এই মিশনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তার সম্ভাব্য ফলাফল কি দাঁড়াতে পারে ইত্যাদি বিষয়ের সামান্য চিত্র তাতে তুলে ধরা হয়েছে। আমেরিকার অরজিনা ভার্সিটির খৃষ্টান প্রফেসর ডক্টর

ডিওড বেরিয়েট এ প্রতিবেদনের উপর বিস্তর গবেষণা-পর্যালোচনা করার পর মন্তব্য করেছেন –

"নিশ্চয়ই এই প্রতিবেদন দুনিয়াজুড়ে খৃষ্টানদের একচ্ছত্র আধিপত্যের ইঙ্গিত বহন করছে। এ আধিপত্য সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনেও হতে পারে, আবার হতে পারে চিন্তানৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক অঙ্গনে। খৃষ্টানদের কর্মতৎপরতা ও সফলতার একটি চিত্র দেখুন – শুধুমাত্র ১৯৯৬ সালের এক বছর সময়েই খৃষ্টানরা সারা দুনিয়ায় বাইবেলের ২৮ বিলিয়ন কপি (আঠারশত কোটি কপি) বিতরণ করেছে। আর এ কথা শুনলে তো রীতিমত অবাক হতে হয় যে, গেলো বছর পর্যন্ত পৃথিবীর নামী-দামী বড় বড় লাইব্রেরীগুলোতে যীশু খৃষ্টের নামে লেখা বই-পত্রের সংখ্যা ৬৫৭৫১ এ দাঁড়িয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৫৩০৯৪ টি বইয়ের প্রচ্ছদে উজ্জ্বল ও স্পষ্ট অক্ষরে যীশু খৃষ্টের নাম লেখা আছে।"

ডক্টর বেরিয়েট আরো বলেন, উক্ত প্রতিবেদনে সে সকল অঞ্চলের আলোচনাও এসেছে যেগুলোতে এখনো পর্যন্ত খৃষ্টধর্মের দাওয়াত পৌঁছেনি। উক্ত প্রতিবেদনে অ-খৃষ্টান রাজ্যসমূহকে 'আলিফ' ও 'বা' – এই দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

"'আলিফ' দ্বারা উদ্দেশ্য সে সকল রাজ্য, যেগুলোতে খৃষ্টধর্মের আওয়াজ বিলকুল পৌঁছেনি। আর 'বা' দ্বারা সে সকল রাজ্য উদ্দেশ্য, যেগুলো খৃষ্টান রাজ্যের পার্শ্ববর্তী ও ভৌগলিক দিক থেকে তার সাথে মিলিত। উক্ত প্রতিবেদনে দাবী করা হয় যে, অ-খৃষ্টান রাজ্যসমূহে অনতিবিলম্বে খৃষ্টধর্মের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভৌগলিক তথ্য, ভাষা ও আঞ্চলিক সব রীতি অভ্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ইতিমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে।

উক্ত প্রতিবেদনের একটি পরিসংখ্যান ছিল এই যে, বর্তমানে অ-খৃষ্টান রাজ্যে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা হলো তের বিলিয়ন। আর এই জনপদগুলোতে বছরে প্রায় ৪৭ মিলিয়ন লোক বাড়ছে। এ হিসেবে দৈনিক ১২৯০০০ নবজাতক শিশু জন্মগ্রহণ করছে। উনিশ শতকে জনসংখ্যার বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র এক মিলিয়ন। এ হিসেবে আশা করা যায়, বিশ শতকে অ-খৃষ্টানদের রাজ্যের জনসংখ্যা ১৪ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে ১৫ বিলিয়নে পৌঁছে যাবে। (এডিটেডঃ হিসাবে কোন একটা প্রবলেম হয়েছে, তবে এটা শিউর যে, "বিলিয়ন" হবে না। হতে পারে মিলিয়নের পরিবর্তে ভুল করে বিলিয়ন লেখা হয়েছে, কিন্তু শিউর না হয়ে কারেক্ট করতে পারছি না।)

পৃথিবীর শতকরা ৮১ ভাগ লোক কোন না কোন ধর্ম পালন করে। এ হিসেবে পৃথিবীতে বর্তমানে নাস্তিক বা স্রস্টায় অবিশ্বাসী লোকের সংখ্যা হলো ১১১০ মিলিয়ন। সারা পৃথিবীতে

১৫ হাজারেরও বেশী ধর্মের প্রচলন রয়েছে। আর দিন দিন তো নতুন ধর্মের সংখ্যা বেড়েই চলছে। এই বৃদ্ধি খৃষ্টানদের ধর্ম প্রচারে বড় বাঁধা। এখন আমরা বাংলাদেশে খৃষ্টান মিশনারীদের কর্মফলাফল, গির্জার সফলতা ও অন্যান্য সংস্থার কারগুজারী ধারাবাহিক উল্লেখ করবো ইন শা আল্লাহ। যা দ্বারা অনুমান করা সহজ হবে যে, বাংলাদেশে তাদের অপতৎপরতা কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইহুদি-খ্রিস্টানদের সম্পর্কে আল্লাহর বাণী

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ- فَتَرَى الَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشَى أَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ- وَيَقُولُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَهَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ أَقْسَمُوْا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِيْنَ-َ

‘হে মুমিনগণ! তোমরা ইহূদী-নাছারাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা তাদের মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না’ (৫১)। ‘অতঃপর তুমি দেখবে যাদের অন্তরে রোগ আছে দ্রুত তাদের মধ্যে প্রবেশ করবে আর বলবে, আমাদের ভয় হয় জানি না আবার কোন বিপদ এসে পড়ে। অতএব সত্বর আল্লাহ বিজয় অথবা তাঁর পক্ষ হ’তে কোন নির্দেশ নিয়ে আগমন করবেন। তখন তারা তাদের অন্তরে লুকানো বস্তুর কারণে লজ্জিত হবে’ (৫২)। ‘আর মুসলমানেরা বলবে, আরে এরাই তো তারা যারা আল্লাহর নামে দৃঢ় শপথ করত যে তারা তোমাদের সাথেই আছে। বস্তুতঃ তাদের সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হ’ল। ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হ’ল’ (মায়েদাহ ৫/৫১-৫৩)।

ব্যাখ্যা : প্রথম আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন ইহূদী ও খৃষ্টানদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব না করে। সাধারণ অমুসলিম এবং ইহূদী ও খৃষ্টানদের রীতিও তাই। তারা গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক শুধু স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে, মুসলমানদের সাথে নয়।

এরপর যদি কোন মুসলমান এ নির্দেশ অমান্য করে কোন ইহূদী বা খৃষ্টানের সাথে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে সে ইসলামের দৃষ্টিতে সে সম্প্রদায়েরই লোক বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

শানে নুযূল : (১) সুদ্দী বর্ণনা করেন যে, ওহোদ যুদ্ধে বিপর্যয়ের ফলে কিছু নওমুসলিম ভীত হয়ে ইহূদী-নাছারাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চায়। তার জবাবে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (২) অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, অর্থ, অস্ত্র ও জনবলে বলিয়ান ইহূদীদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করা না করার ব্যাপারে হযরত উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন যে, আমি তাদের সাথে বন্ধুত্ব ত্যাগ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই। পক্ষান্তরে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই বলল যে, এটা আমার জন্য বিপজ্জনক'। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[1] (৩) আরেকটি বর্ণনায় এসেছে যে, ওহোদ যুদ্ধে বিপর্যয়ের ফলে কিছু লোক নবুঅতের যথার্থতার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে। ইহূদী নেতা কা'ব ইবনুল আশরাফ ৪০ জন ঘোড় সওয়ার নিয়ে গোপনে মক্কায় চলে যায় এবং আবু সুফিয়ানের সাথ চুক্তিবদ্ধ হয়। অতঃপর আবু সুফিয়ান তাদের সাথে কা'বা গৃহে গিয়ে গেলাফ ধরে আল্লাহর নামে শপথ করে। এ খবর রাসূলের কানে পৌঁছলে তিনি মুহাম্মাদ বিন মাসলামাকে পাঠিয়ে কা'বকে ভোর রাতে তার বাড়ীতে হত্যা করেন।[2] অতঃপর সেদিনই সকালে বনু নাযীর গোত্রকে অবরোধ করেন।[3] অতঃপর মুনাফিকদের আচরণ সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াতটি অবতীর্ণ হলঃ

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ

'অতঃপর তুমি দেখবে যাদের অন্তরে রোগ আছে দ্রুত তাদের মধ্যে প্রবেশ করবে আর বলবে, আমাদের ভয় হয় জানি না আবার কোন বিপদ এসে পড়ে' (মায়েদাহ ৫/৫২)।

আল্লাহ এর উত্তরে বলেন,

فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِين-َ

'অতএব সত্বর আল্লাহ বিজয় অথবা তাঁর পক্ষ হ'তে কোন নির্দেশ নিয়ে আগমন করবেন। তখন তারা তাদের অন্তরে লুকানো বস্তুর কারণে লজ্জিত হবে' (মায়েদাহ ৫/৫২ বাকী অংশ)।

তৃতীয় আয়াতে এ বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, যখন মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচিত হবে এবং তাদের বন্ধুত্বের দাবী ও শপথের স্বরূপ ফুটে উঠবে, তখন মুসলমানরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলবে, এরাই কি আমাদের সাথে আল্লাহর নামে দৃঢ় শপথ করে বন্ধুত্বের দাবী করত? আজ এদের সব লোক দেখানো ধর্মীয় কার্যকলাপই বিনষ্ট হয়ে গেছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের ব্যর্থতা ও লাঞ্ছনার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার বাস্তব চিত্র কিছুদিন পরে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে সবাই প্রত্যক্ষ করেছিল।

আল্লাহ বলেন,

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَّلاَ نَصِيرٍ-

‘ইহূদী-নাছারারা কখনোই তোমার উপর সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে। তুমি বল, নিশ্চয়ই আল্লাহর দেখানো পথই সঠিক পথ। আর যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তোমার নিকটে (অহি-র) জ্ঞান এসে যাওয়ার পরেও, তবে আল্লাহর কবল থেকে তোমাকে বাঁচাবার মতো কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই’ (বাক্বারাহ ২/১২০)।

আয়াতে উল্লেখিত ‘মিল্লাত’ অর্থ দ্বীন ও শরী‘আত (কুরতুবী) এবং ‘ইল্ম’ অর্থ কুরআন ও সুন্নাহ (ইবনু কাছীর)। অত্র আয়াতের উপরে ভিত্তি করে ইমাম আবু হানীফা, শাফেঈ, দাঊদ ইবনে আলী, আহমাদ প্রমুখ বিদ্বানগণ বলেন, أَنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَّاحِدَةٌ ‘কাফেরগণ সকলেই এক মিল্লাত ভুক্ত’ (কুরতুবী)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ- ‘মুসলিম কোন কাফিরকে ওয়ারিছ বানায় না বা কোন কাফির কোন মুসলিমকে ওয়ারিছ বানায় না’।[4] তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে শত্রুতা করেছিল কেবলমাত্র ‘ইসলাম’-এর কারণে। সেকারণ আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে জানিয়ে দিলেন যে, তারা কখনোই তার উপরে খুশী হবে না, যতক্ষণ না তিনি তাদের মিল্লাতভুক্ত হবেন। অতঃপর তিনি রাসূলকে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ দিলেন’ (কুরতুবী)।

কুরআন অবতরণের পরে তাওরাত-ইঞ্জীল মানসূখ হয়ে গেছে। এসবের কোন হুকুম এখন আর কারু জন্য পালনযোগ্য নয়। মূল তাওরাত ও ইঞ্জীলের কোন অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। পুরাতন ও নতুন সমাচার (Old & New Testament) বলে প্রচলিত বই সমূহ তাদের নিজেদের রচিত। বিশ্ব মানবতাকে তাই এখন কেবলমাত্র কুরআন-সুন্নাহ মেনে চলতে হবে। ইমাম শাওকানী বলেন, ‘ইহূদী-নাছারাদের শরী‘আত এখন মানসূখ বা হুকুম রহিত। তাদের কিতাব সমূহ পরিবর্তিত হয়ে গেছে’। এখন তাদের কিতাবের অনুসরণ করা অর্থ তাদের খোশখেয়াল সমূহের অনুসরণ করা’। তিনি বলেন, ‘এই আয়াতগুলির মধ্যে উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য হুঁশিয়ারী ও সাবধানবাণী রয়েছে যে, তারা যেন ইহূদী-নাছারা বা কোন মুশরিক ও বিদ‘আতী দলসমূহের পাতা ফাঁদে পা না দেয় বা তাদের সন্তুষ্টি ও সমর্থন কামনা না করে। তারা যেন কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিধানসমূহ ছেড়ে এইসব দলের চোখ ধাঁধানো ও দুষ্ট মতবাদ সমূহের পিছনে না ছোটে’ (শাওকানী, ফাৎহুল ক্বাদীর)।

সৈয়দ রশীদ রিযা বলেন, অত্র আয়াতে ‘আহলুল কিতাব’ না বলে ‘ইয়াহূদ’ ও ‘নাছারা’ বলার তাৎপর্য এই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুমিন সম্প্রদায়ের সাথে তাদের শত্রুতা মূলতঃ কিতাবের কারণে ছিল না। কেননা তাদের কিতাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে বলেনি। বরং তাদের এই দুশমনী ছিল স্রেফ রাজনৈতিক ও দলীয় হিংসার কারণে। ইবনু জারীর ত্বাবারী বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা সকল মুসলমানকে নির্দেশ দিচ্ছেন তারা যেন ঈমানদারগণের বিরুদ্ধে ইহূদী-নাছারাকে তাদের আন্তরিক বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করে। যে ব্যক্তি এটা করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ, রাসূল ও মুমিনদের দলের বাইরে চলে যাবে। আল্লাহ ও রাসূল তাদের থেকে মুক্ত’।[5]

শুধু ইহূদী-খৃষ্টান নয়, বরং কোন কাফেরের সাথে কোনরূপ বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে নিষেধ করে বলা হচ্ছে, لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، ‘মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে তোমরা যদি তাদের থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা কর’ (আলে ইমরান ৩/২৮)। দুনিয়াবী সম্মান লাভের জন্য যাতে এটা না করা হয়, সেজন্য বলা হয়েছে, الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ‘যারা মুমিনদের বাদ দিয়ে কাফিরদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে সম্মান কামনা করে? জেনে রেখো সর্বপ্রকার ইযযতের মালিকানা স্রেফ আল্লাহর’ (নিসা ৪/১৩৯)। এমনকি নিজের বাপ-ভাই যদি ঈমানের উপরে কুফরীকে ভালবাসে, তবে তাদেরকেও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না (তওবাহ ৯/২৩)। মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ করে কোন মুসলিম দেশের জাতীয় ও পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অত্র আয়াতগুলি স্থায়ী মূলনীতি স্বরূপ।

[1]. কুরতুবী ৬/২১৬; ইবনু কাছীর ২/৭১; ইবনু জারীর ৬/১৭৮-১৭৯।

[2]. বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৪০৩৯।

[3]. কুরতুবী ১৮/৪।

[4]. বুখারী হা/৬৭৬৪; মুসলিম হা/১৬১৪; মিশকাত হা/৩০৪৩ ‘ফারায়েয’ অধ্যায়, রাবী উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)।

[5]. মুখতাছার তাফসীরুল মানার ২/৩৪৮।

ইহুদি-খ্রিস্টানদের ইতিহাস চির কপটতার ইতিহাস

(১) রাসূলকে হত্যার ষড়যন্ত্র : হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসরত বনু নাযীর, বনু কুরায়যা প্রমুখ ইহূদী-নাছারা গোত্রসমূহের সাথে এক সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করেন, যা ইতিহাসে 'মদীনার সনদ' নামে পরিচিত। উক্ত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কেউ কারু বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে না। বরং পরষ্পরে মিলে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুনাফিকের প্ররোচনায় ও কাফিরদের আহবানে তাদের গোত্রে দ্বীন প্রচারের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৭০ জনের একটি প্রচারকদল পাঠালে তারা সকলেই মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের শিকার হন। ইতিহাসে যা বি'রে মা'ঊনার ঘটনা বলে প্রসিদ্ধ। উক্ত হত্যাকান্ড থেকে বেঁচে যাওয়া মাত্র একজন ছাহাবী আমর বিন উমাইয়া যামীরী মদীনায় ফেরার পথে শত্রুপক্ষীয় দু'জন কাফেরকে পেয়ে হত্যা করে ফেলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এ দু'জন ছিল বনু আমের গোত্রের লোক, যাদের সঙ্গে রাসূলুললাহ (ছাঃ)-এর শান্তিচুক্তি ছিল। কিন্তু সেকথা উক্ত ছাহাবী জানতেন না। তাদের সাথে বনু নাযীরেরও শান্তিচুক্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন ঐ দুই নিহত ব্যক্তির রক্তমূল্য আদায়ের জন্য মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়ার পরে মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে বনু নাযীর ইহূদী গোত্রে গমন করেন। হযরত আবুবকর, ওমর, আলী প্রমুখ ছাহাবী তাঁর সাথে ছিলেন। বনু নাযীর গোত্র তাঁদেরকে সসম্মানে একটি প্রাচীরের ছায়ায় বসতে দিল এবং গোত্রের লোকদের নিকট থেকে চাঁদা তুলে এনে তাঁকে দেবার প্রতিশ্রুতি দিল। ইতিমধ্যে তাদের মধ্যে দুষ্টবুদ্ধি জেগে উঠল এবং এই সুযোগে রাসূলকে হত্যা করার ফন্দি অাঁটলো এবং বললঃ কে আছ এই লোকটিকে হত্যা করে এর হাত থেকে আমাদের শান্তি দিতে পার? তখন আমর বিন জাহহাশ বিন কা'ব নামক জনৈক ইহূদী সঙ্গে সঙ্গে রাযী হয়ে গেল এবং বড় একটি পাথর তাঁদের উপরে ফেলে মারার জন্য প্রাচীরের উপরে উঠে গেল। অহি-র মাধ্যমে এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে দ্রুত সেখান থেকে প্রস্থান করলেন এবং চুক্তিভঙ্গের অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। অবশ্য তিনি তাদেরকে অস্ত্র ব্যতীত কেবল এক উট বোঝাই মাল-সামান নিয়ে তাদের ইচ্ছামত স্থানে চলে যাবার জন্য ১০ দিনের সুযোগ দিলেন। কিন্তু মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও তার সাথীদের প্ররোচনায় তারা তাদের মযবূত প্রাচীর বেষ্টিত দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে অবস্থান নেয়। কিন্তু পরিশেষে মুনাফিকদের নিকট থেকে কোন সাহায্য না পাওয়ায় এবং রাসূল (ছাঃ)-এর চূড়ান্ত নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়ায় তারা ২১ দিন পরে দুর্গ ছেড়ে বের হয়ে আসে এবং রাসূলের নির্দেশ মতে তারা أرض الحشر অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন মানুষের জমা হওয়ার স্থান শাম দেশ (সিরিয়া) অভিমুখে চলে যায়। হুয়াই বিন আখত্বাব, আব্দুল্লাহ বিন আবিল হুক্বাইক্ব, কিনানা বিন রাবী' প্রমুখ ইহূদী নেতৃবৃন্দ ও তাদের সাথীরা খায়বারে বসতি স্থাপন করেন। কেউ কেউ শামের অন্যস্থানে চলে যায়। ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক বলেন যে, এই ঘটনা ওহোদ যুদ্ধের পরে ৪র্থ হিজরীতে এবং বি'রে মা'ঊনার মর্মান্তিক ঘটনার পরে সংঘটিত হয়। কুরতুবী এ মত সমর্থন

করেন। তবে বুখারী যুহরীর মাধ্যমে ওরওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ ঘটনা ২য় হিজরীতে অনুষ্ঠিত বদর যুদ্ধের ছয় মাস পরে এবং ওহোদে পূর্বে সংঘটিত হয়’।[1] মদীনা তথা আরব উপদ্বীপ থেকে তাদের এই উচ্ছেদ ঘটনাকে কুরআনে أول الحشر বা ‘প্রথম একত্রিত উচ্ছেদ’ বলে অভিহিত করা হয়েছে।[2]

তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে খায়বরে এটা ছিল প্রথম উচ্ছেদ। দ্বিতীয় উচ্ছেদ ঘটে ওমর ফারূকের সময়ে তাদের কুফরী ও ওয়াদা ভঙ্গের কারণে খায়বর থেকে নাজদ ও আযরি‘আতে। কেউ কেউ বলেন, যেরুযালেমের আরীহা ও তাইমাতে’।[3] মূলতঃ হারূণ (আঃ)-এর বংশোদ্ভূত এই গোত্র সিরিয়া থেকে মদীনায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল শেষনবীর আগমনের আশায়। কিন্তু শেষনবী বনু ইসরাঈল না হয়ে বনু ইসমাঈল হওয়ায় তারা তাঁকে চিনতে পেরেও অস্বীকার করে স্রেফ বংশীয় অহংকারের যিদে পড়ে (ঐ)।

(২) চুক্তি ভঙ্গ : মদীনার বনু নাযীর ও বনু কুরায়যা প্রভৃতি ইহূদী-নাছারা গোত্রগুলি বদর যুদ্ধ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কৃত চুক্তির প্রতি অনুগত ছিল। বরং বদর যুদেধ অভাবিত বিজয় লাভের ফলে তাদের মধ্যে রাসূলেল প্রতি আগ্রহ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু ওহোদ যুদ্ধ বিপর্যয়ের ফলে ও মুশরিকদের অব্যাহত প্ররোচনার ফলে তাদের মধ্যে চুক্তি ভঙ্গের প্রবণতা দানা বেঁধে ওঠে এবং তাদের অন্যতম নেতা কা‘ব বিন আশরাফ ৪০ জন ইহূদীকে সাথে নিয়ে গোপনে মক্কায় চলে যায় ও সেখানে কুরায়েশ নেতাদের নিয়ে কা‘বা গৃহের গেলাফ স্পর্শ করে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে।[4]

(৩) শত্রুর সহযোগিতা : ৪র্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধের সময় বনু কুরায়যা গোত্র মদীনা আক্রমণকারী কাফের দলসমূহের সাথে সহযোগিতা করে। ফলে সন্ধি চুক্তি ভঙ্গের কারণে তাদের পুরুষদের হত্যা করা হয় ও বাকীদের বন্দী করা হয় ও মাল-সম্পদ সবকিছু মুসলমানদের মধ্যে বন্টিত হয়।[5]

ইহূদী-খৃষ্টানদের এই মুসলিম বিদ্বেষের ইতিহাস রাসূলের যুগ থেকে এ যাবত জারি আছে। যদিও সে যুগে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর মত সরলপ্রাণ খৃষ্টান নরপতি ছিলেন। যিনি শুধু মুসলমানদের সাহায্য করেননি; বরং গোপনে ইসলাম কবুল করেছিলেন বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। অমনিভাবে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যেও বহু ইহূদী-খৃষ্টান রয়েছেন, যারা ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি সহানুভূতিশীল সে যুগেও ছিলেন, এ যুগেও আছেন। বনু নাযীরকে যখন মদীনা থেকে উচ্ছেদ করা হয়, তখনও তাদের মধ্যকার দু’জন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে নিরাপদে মদীনায় থেকে যান। আজও যখন ফিলিস্তীনের অসহায় মুসলমান নর-নারী ও শিশুদের

উপরে আমেরিকা ও বৃটেনের সহায়তায় বর্বর ইহূদী শাসকরা নির্মম হত্যাকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে, তখনও সেখানে বহু শান্তিপ্রিয় ইহূদী আরব এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতবিাদ মিছিল করে যাচ্ছে। নিউইয়র্কে ও পেন্টাগনে আত্মঘাতি বিমান হামলা চালানোর প্রতিশোধ নিতে যুদ্ধবাজ বুশ প্রশাসন যখন ওসামা বিন লাদেনকে সন্দেহ করে ভূখা-নাঙ্গা আফগান জনগণের উপর ভয়ংকর হামলা পরিচালনার হুমকি দিচ্ছে এবং আমেরিকার সরকারী ও বিরোধীদল সর্বসম্মতিক্রমে এই হামলা পরিকল্পনা অনুমোদন করছে, তখনও দেখা যাচ্ছে নিউইয়র্ক সিটিতে হাযার হাযার খৃষ্টান ছাত্র যুদ্ধের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করে প্লাকার্ড বহন করে মিছিল করছে। এধরনের ব্যতিক্রম চিরকাল ছিল আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে ইনশাআল্লাহ।

কিন্তু সাধারণভাবে সকল ইহূদী-খৃষ্টান মুসলিম উম্মাহর শত্রু। বিশেষ করে ইহূদীরাই সবচেয়ে বড় শত্রু। ইবনু কাছীর বলেন, এর কারণ হ'ল এই যে, এদের ইসলাম বিদ্বেষ হ'ল হঠকারিতাসূলভ। এরা ইসলাম ও শেষ নবীকে হক জেনেই অস্বীকার করে কেবল বংশীয় অহংকার বশে। তারা বনী ইসরাঈলের বহু নবীকে হত্যা করেছে। অবশেষে আখেরী নবীকে কয়েকবার হত্যা প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তাঁকে বিষ প্রয়োগ করেছে ও জাদু করেছে'। ইহূদীদের চাইতে নাছারাগণ মুসলমানদের কিছুটা নিকটবর্তী হবার কারণ এই যে, তারা নিজেদেরকে ঈসা (আঃ)-এর আনীত ইঞ্জীল কিতাবের অনুসারী বলে দাবী করে। তাছাড়া নাছরাদের মধ্যে বহু দুনিয়াত্যাগী সরলপ্রাণ ধর্মযাজক আছেন, যাদের সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে'।[6]

(৪) খাদ্যে বিষপ্রয়োগ : খায়বরের ইহূদীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মেহমান হিসাবে দা'ওয়াত দিয়ে খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে।[7]

(৫) চূলে জাদু : মুনাফিক লাবীদ বিন আ'ছাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চূলে জাদু করে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটানোর চেষ্টা করে।[8]

(৬) ক্রুসেড ঘোষণা : **১০৯৮-১২৯১** খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২০০ বছর ব্যাপী ক্রুসেড যুদ্ধের ফলে খৃষ্টান-মুসলিম সম্ভাব দূর হয়ে যায়। অবশেষে ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর হাতে গোটা ইউরোপীয় খৃষ্টান শক্তি চরমভাবে মার খায়। এই পরাজয়ের গ্লানি তারা কখনো ভুলেনি। তাই **১**ম মহাযুদ্ধের সময় **১৯১৭** সালের ডিসেম্বরে যখন যেরুযালেম মুসলমানদের হাত থেকে বৃটিশ খৃষ্টানদের হাতে চলে যায়, সেদিন যেরুযালেমের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে বৃটিশ জেনারেল এলেনবাই বলেছিল "Today ends the crusade" 'আজকে ক্রুসেড শেষ হ'ল'। **১৯২০** সালে ফরাসী জেনারেল গুরিয়ান একইভাবে সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর কবরে পা রেখে বলে ওঠেন, "We have come back Saladin" 'ছালাহুদ্দীন আমরা আবার ফিরে এসেছি'।

(৭) অবৈধ ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্টা: রাশিয়া থেকে বিতাড়িত ইহূদীদেরকে খৃষ্টানরাই ফিলিস্তীনে জোরপূর্বক বসতি স্থাপনে বাধ্য করে এবং তাদেরকে সামনে রেখে ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে তারিখে অবৈধ 'ইসরাঈল' রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে এ যাবত তাদেরকে দিয়েই দৈনিক মুসলিমদের রক্ত ঝরাচ্ছে এবং সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যের উপরে ছড়ি ঘুরাচ্ছে।

(৮) চির অভিশপ্ত : সূরায়ে ফাতিহাতে বর্ণিত 'মাগযূব' (অভিশপ্ত) ও 'যা-ল্লীন' (পথভ্রষ্ট)-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী উদ্ধৃত করেন যে, إِنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمُ الْيَهُودُ وَإِنَّ الضَّالِّينَ النَّصَارَى 'অভিশপ্ত হ'ল ইহূদীরা এবং পথভ্রষ্ট হ'ল নাছারাগণ' (সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২৬৩)। মুসলিম মুফাসসিরগণের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, উভয় দলই আল্লাহর গযব ও লা'নতপ্রাপ্ত। তবে উভয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য এই যে, ইহূদীরা ইসলাম-এর সত্যতা উপলব্ধি করেও তা যিদ ও অহংকারবশে প্রত্যাখ্যান করে (কারণ শেষ নবী (ছাঃ) তাদের বংশে জন্মগ্রহণ না করে ইসমাঈলের বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন)। পক্ষান্তরে নাছারাগণের নিকটে ইসলাম সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই। ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। তারা ভ্রষ্টতার অন্ধকারে পথ হাতড়িয়ে ফিরছে। আল্লাহ নিজেই তাদের এ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন, قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ 'তারা পূর্বেই পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সঠিক রাস্তা হতে পথভ্রষ্ট হয়েছে' (মায়েদাহ ৭৭)।

ইহূদীদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُون 'এবং তাদের উপরে আরোপ করা হ'ল লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহর গযবে পতিত হ'ল। এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহর আয়াত সমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করেছিল। কারণ তারা ছিল না-ফরমান ও সীমালংঘনকারী' (বাক্বারাহ ২/৬১)। ইবনু আববাস বলেন, ১০ জন ব্যতীত বাকী সকল নবী ছিলেন বনী ইসরাঈলের।[9] কিন্তু তারা কোন নবীকেই মানতে চায়নি। বরং একই দিনে ৩০০ নবীকে এরা হত্যা করেছে বলে ইবু মাসঊদের একটি বর্ণনায় জানা যায়।[10]

ইহূদী-নাছারাদের অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হওয়ার যে চারটি কারণ পবিত্র কুরআনে (মায়েদাহ ৪১-৪২) বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল: আল্লাহর কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জীলকে বিকৃত করা। তাওরাত-ইঞ্জীল বিকৃত হওয়ার কারণ হ'ল এই যে, এর হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ ইহূদী-নাছারাদের উপরেই ন্যস্ত করেছিলেন (মায়েদাহ ৪৪)। কিন্তু যথাযথ হেফাযত না করে তারা ইচ্ছামত সেখানে শব্দগত ও অর্থগত পরিবর্তন ঘটায় (বাক্বারাহ ৭৫, নিসা ৪৬, মায়েদাহ ১৩-১৪)। পক্ষান্তরে কুরআনের হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন (হিজর

৯)। ফলে বিগত ১৪০০ বছরেও তার একটি নুকতা-হরফ পরিবর্তন হয়নি। যদিও ইসলামের শত্রুরা এ যাবত বহু অপতৎপরতা চালিয়েছে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاس ‘তারা পৃথিবীর যেখানেই অবস্থান করবে, সেখানেই তাদের উপরে লাঞ্ছনা আরোপিত হবে কেবলমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ও মানব প্রদত্ত মাধ্যম ব্যতীত’ (আলে ইমরান ৩/১১২)। আল্লাহ প্রদত্ত মাধ্যম অর্থ যাদেরকে আল্লাহ পাক নিজ বিধান অনুসারে আশ্রয় ও অভয় দিয়েছেন। যেমন নারী-শিশু, সাধক-উপাসকগণ, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় না। তারা নিরাপদে থাকবে। অতঃপর মানবপ্রদত্ত মাধ্যম অর্থ হ’লঃ মুসলমান বা অমুসলিম কোন শক্তির সাথে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে তাদের আশ্রয়াধীন হয়ে সাময়িক নিরাপদে বসবাস করতে পারবে। ১৯৪৮ সালে ‘ইসরাঈল’ নামে প্রতিষ্ঠিত অবৈধ রাষ্ট্রটি মূলতঃ আমেরিকা, বৃটেন ও রাশিয়া তথা খৃষ্টান ও অমুসলিম অক্ষশক্তির সৃষ্ট মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি সামরিক ঘাঁটি ছাড়া আর কিছুই নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সাহায্যমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে তথাকথিত এ রাষ্ট্রটি একমাসও টিকতে পারবে কি-না সন্দেহ। এরপরেও বিগত ৫২ বছর তাদেরকে সর্বদা যুদ্ধাবস্থার মধ্যে থাকতে হয়েছে এবং থাকতে হয়েছে এক প্রকার বিশ্বপরিত্যক্ত ও নিঃসঙ্গ অবস্থায়। অতএব বাহ্যিক নিরাপত্তা লাভ করলেও মানসিক শান্তিতে তারা একটি রাতও কাটাতে পারেনি। এসবই আল্লাহর গযবের ফল। একই অবস্থা এখন বৃটেন-আমেরিকান-ইউরোপিয়ান খৃষ্টান অক্ষশক্তির। সর্বত্র তারাএখন ‘বিশ্ব সন্ত্রাসী’ নামে অভিহিত। সর্বত্র আজ আমেরিকা নিন্দিত ও ধিকৃত। বস্ত্তগত শক্তিতে বলিয়অন হলেও তাদের মানসিক জগত ক্রমেই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। ফলে খোদ আমেরিকায় এখন দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করছে। মুসলমান এখন সেদেশের দ্বিতীয় প্রধান সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে।

[1]. তাফসীর ইবনে কাছীর ৪/৩৫৪-৩৪৮; তাফসীরে কুরতুবী ১৮/৪-৮; ফাৎহুল বারী ‘মাগাযী’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৬৪; ৭/৩৮৪।

[2]. সূরা হাশর ২য় আয়াত; বুখারী ২/৫৭৪।

[3]. তাফসীরে কুরতুবী ১৮/২।

[4]. কুরতুবী ১৮/৪; বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৪০৩৯।

[5]. ফাৎহুল বারী ৭/৪৫২-৫৩ ‘মাগাযী’ অধ্যায় হা/৪০৯৭-৪১০০।

[6]. মায়েদাহ ৮২-৮৫; তাফসীর ইবনে কাছীর ২/৮৮।

[7]. তাফসীর ইবনু কাছীর ২/৮৮; বুখারী ১/৪৪৯, ২/৬২০/৮৬০।

[8]. তাফসীর ইবনে কাছীর ৪/৬১৪।

[9]. তাফসীর ইবনে কাছীর ১/১৯৩।

[10]. তাফসীর ইবনে কাছীর ১/১০৬।

মুসলিম হিসেবে আমাদের করনীয়

عَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَثَلُ القَائِمِ في حُدُودِ اللهِ وَالوَاقعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَومٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَصَارَ بَعْضُهُمْ أعْلاها وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، وَكَانَ الَّذِينَ في أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا: لَوْ أنَّا خَرَقْنَا في نَصِيبِنَا خَرْقاً وَلَمْ نُؤذِ مَنْ فَوقَنَا، فَإنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً، وَإنْ أَخَذُوا عَلَى أيدِيهِمْ نَجَوا وَنَجَوْا جَمِيعاً رواه البخاري

নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহর নির্ধারিত সীমায় অবস্থানকারী (সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদানকারী) এবং ঐ সীমা লংঘনকারী (উক্ত কাজে তোষামোদকারীর) উপমা হল এক সম্প্রদায়ের মত; যারা একটি দ্বিতলবিশিষ্ট পানি-জাহাজে লটারি করে কিছু লোক উপর তলায় এবং কিছু লোক নিচের তলায় স্থান নিল। (নিচের তলা সাধারণতঃ পানির ভিতরে ডুবে থাকে। তাই পানির প্রয়োজন হলে নিচের তলার লোকদেরকে উপর তলায় যেতে হয় এবং সেখান হতে সমুদ্র বা নদীর পানি তুলে আনতে হয়।) সুতরাং পানির প্রয়োজনে নিচের তলার লোকেরা উপর তলায় যেতে লাগল। (উপর তলার লোকদের উপর পানি পড়লে তারা তাদের উপর ভাগে আসা অপছন্দ করল। তারা বলেই দিল, 'তোমরা নিচে থেকে আমাদেরকে কষ্ট দিতে এসো না।') নিচের তলার লোকেরা বলল, 'আমরা যদি আমাদের ভাগে (নিচের তলায় কোন স্থানে) ছিদ্র করে দিই, তাহলে (দিব্যি আমরা পানি ব্যবহার করতে পারব) আর উপর তলার লোকদেরকে কষ্টও দেব না। (এই পরিকল্পনার পর তারা যখন ছিদ্র করতে শুরু করল) তখন যদি উপর তলার লোকেরা তাদেরকে নিজ ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয় (এবং সে কাজে বাধা না দেয়), তাহলে সকলেই (পানিতে ডুবে) ধ্বংস হয়ে যায়। (উপর তলার লোকেরা সে অন্যায় না করলেও রেহাই পেয়ে যাবে না।) পক্ষান্তরে উপর তলার লোকেরা যদি তাদের হাত ধরে (জাহাজে ছিদ্র করতে) বাধা দেয়, তাহলে তারা নিজেরাও বেঁচে যায় এবং সকলকেই বাঁচিয়ে নেয়।" (বুখারী ২৪৯৩, ২৬৮৬, তিরমিযী ২১৭৩)

হাদিস সম্ভার, হাদিস নং ১৫৯৭
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুসলিম নেতাদের চিঠির মাধ্যমে দাওয়াত দিতেন।আমাদের চিঠি পাওয়া অমুসলিম ভাইদের হক।

খৃষ্টান মিশনারির ধর্মান্তরের শিকার হয়ে অনেক সাধারণ মুসলমান চিরদিনের জন্য সরলপথ হারিয়ে জাহান্নামী হচ্ছে। প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রচার করে মুসলিম মনন-মস্তিস্ককে খৃষ্টবাদের ছাঁচে নেওয়ার কৌশল করছে। এমতাবস্থায় প্রিয় ছাত্রভাইদের কর্তব্য, মিশনারিগুলোর তৎপরতার অবগতি ও তা দূর করার পন্থা চর্চার মাধ্যমে তাদের খৃষ্টরাজ্য গড়ার স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করা এবং তাদের অপতৎপরতার গতিকে রুখে দেওয়া। এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে কয়েকটি কাজ করা পেতে পারে -

(১) মিডিয়াঃ মিডিয়ার মাধ্যমে সত্যকে সত্য হিসেবে মানুষের সামনে তুলে ধরা, যাতে তারা মিডিয়ায় অপপ্রচার চালিয়ে ইসলামের ক্ষতি সাধনে ব্যর্থ হয়।

(২) রাজনীতিবিদদের সতর্ক করাঃ খৃষ্টান মিশনারিগুলো এ দেশের রাজনৈতিক ফিল্ড নিজেদের দখলে আনার জন্য রাজনীতিবিদদের মগজ ধোলাই কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। তারা নেতাদের কাছে উপঢৌকন ও উপহার পেশ করে নিজেদের পক্ষে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে এবং অর্থ-কড়ির মাধ্যমে স্বার্থ হাসিলের জোর তৎপরতায় লিপ্ত হচ্ছে। এর উৎকৃষ্ট নজির জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও ফতোয়া বিরোধী রায় বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা। তাদের এ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে আমাদের উচিত রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সরকারী বেসরকারি সিনিয়র কর্মকর্তা ও সব শ্রেণীর লোকদের উক্ত বিষয়ে সরাসরি ও চিঠির মাধ্যমে সতর্ক করা।

(৩) লেখালেখিঃ আজ লেখালেখি ও প্রকাশনার দিক দিয়েও তারা পিছিয়ে নেই বরং একধাপ এগিয়েই আছে। খৃষ্টান মিশনারিগুলো মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বই লিখে প্রচার করছে। তার মধ্যে কয়েকটি বইয়ের নাম আমি আপনাদের সামনে পেশ করছি – "গুনাহগারদের জন্য বেহেশতের পথ" (এই নামটির শুরুতে আরবিতে লেখা – "ত্বারিকুল জান্নাতি লিল মুযনিবি"), বেলালের লেখা "আপনার জন্য আমার অন্তরের কথা", "গুনাহ থেকে মুক্তির পথ", "কুরআনের আলোকে জান্নাতের পথ" ইত্যাদি। এগুলো হলো মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে লেখা খৃষ্টানদের বই। কিন্তু আফসোসের সাথে বলতে হয়, খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে কিংবা হিন্দুদের উদ্দেশ্যে লেখা কয়টি বই আছে আমাদের ?

আমার ভাই, আমাকে একটি বই দেখান যে, এই বইটি খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে লিখে তাদের মাঝে প্রচার করা হচ্ছে।

ভাই আমার, উঠুন, জাগুন, প্রতিজ্ঞা করুন আর টার্গেট বানান যে, আপনিও কিছু লিখবেন। অমুসলিমদের উদ্দেশ্যে লিখবেন আর তাদের কাছে প্রচার করবেন। (নোটঃ এ বিষয়ে বেশ কিছু আলিমের লিখিত বই রয়েছে, এর মধ্যে অন্যতম একটি বইয়ের নাম আর্টিকেলের শেষে

উল্লেখ করা হলো) আজ তারা আমাদের দেশের লেখকদের কিনে নিয়েছে আর তাদেরকে ভ্রান্ত মতবাদটি বুঝাতে সচেষ্ট হয়েছে এবং বড় বড় লেখকদের কলম থেকে তাদের মতবাদ ও দাওয়াত প্রচার করাচ্ছে। আমরা কি কখনো সেই কলামিস্টদের কাছে গিয়েছি ? ইসলামের হক্কানিয়াত তাদের সামনে উপস্থাপন করেছি ? আমরা কি তাদের বুঝিয়েছি যে, আখিরাতের ফিকির করে, ভবিষ্যৎকে চিন্তা করে আপনাকে ইসলামের পক্ষে লিখতে হবে ? উত্তর যদি "না" হয়, তাহলে তাদের কাছে কে যাবে ? কারা তাদেরকে বুঝাবে ? তাদের কাছে কি দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য আসমান থেকে কোন ফেরেশতা আসবে ? না বন্ধু, না। আমাকে-আপনাকেই যেতে হবে।

উঠুন বন্ধু, আর কতোদিন ঘুমিয়ে থাকবেন, ঘুমিয়ে থাকার আর সময় নেই।

উলামায়ে কেরামের করণীয়

উলামায়ে কেরাম হলেন ধর্মীয় অভিভাবক। আর ধর্মীয় অভিভাবকদের দায়িত্ব তো আরো বেশী। ছকে বাঁধা দ্বীনি খেদমতে আবদ্ধ হয়ে থাকা তাদের শান নয়। সমাজের গভীরে অনুপ্রবেশকারী মিশনারি ও তাদের তাবেদার এনজিওদের অপতৎপরতার প্রতি সুতীক্ষ্ণ নজর রাখা তো তাদের ফরয কর্তব্য।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লক্ষ কোটি উম্মত সমাজের মিশন-আখড়ায় বন্দী হয়ে খৃষ্টান জগতে পাচার হয়ে চিরতরে জাহান্নামে ঝাঁপ দিচ্ছে – এ নিয়ে তাদের মাথা ব্যাথা থাকা প্রয়োজন। যারা দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে অহর্নিশ মানবেতর জীবন যাপন করছে, যাদের রোগে শোকে সান্ত্বনা দেওয়ার কেউ নেই, তাদের পাশে দাঁড়াবার মানসিকতা গড়ে উঠা আজ সময়ের দাবী।

কতো ভালো হতো, যদি উলামায়ে কেরাম নিম্ন বর্ণিত বিষয়ের প্রতিও মনোযোগী হতেন –

(১) সরাসরি খৃষ্টানদের দাওয়াত দেওয়া, বিশেষ করে যারা খৃষ্টধর্মের প্রচারক।

(২) ব্র্যাক, আশা ইত্যাদি স্কুলের মোকাবেলায় মসজিদে মসজিদে মক্তব প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রতিটি গ্রামে একটি করে ইসলামিক কিন্ডারগার্ডেন স্কুল কায়েম করা।

(৩) ব্র্যাক স্কুল, আনন্দ স্কুল ইত্যাদি স্কুলে মুসলমান বাচ্চাদের ইসলামী শিক্ষা দেওয়ার জন্য ধর্মীয় শিক্ষকের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা।

(৪) অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য ছাত্রদেরকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করা।

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলেছেন -

۞يَاأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۚۥ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ

হে রাসূল! তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা প্রচার কর। যদি (তা) না কর, তবে (তার অর্থ হবে) তুমি আল্লাহর বার্তা পৌঁছালে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষের (ষড়যন্ত্র) থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।

সূরা মায়েদা, আয়াত ৬৭

ব্যবসায়ী ও বিত্তবানদের করণীয়

আল্লাহ আপনাদের অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন আল্লাহ’র রাস্তায় খরচ করার জন্য। আজ খৃষ্টানরা যদি তাদের আয়ের ১০ ভাগের ১ ভাগ তাদের মিথ্যা ধর্ম প্রচারের জন্য খরচ করতে পারে, তাহলে আমরা কেন আমাদের সত্য ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে খরচ করতে পারবো না। আমাদের তো বরং দ্বীন প্রচারের জন্য প্রয়োজনে সমস্ত সম্পদ ব্যয় করার মন-মানসিকতা থাকতে হবে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ مَنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِرواه مسلم

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন গর্হিত কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়। যদি (তাতে)

ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ জিভ দ্বারা (উপদেশ দিয়ে পরিবর্তন করে)। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করে)। আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।" (আহমাদ ১১০৭৪, মুসলিম ১৮৬, আসহাবে সুনান)

হাদিস সম্ভার, হাদিস নং ১৫৯০
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

عَن حُذَيفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ المُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ رواه الترمذي، وَقالَ حديث حسن

হুযাইফাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "তাঁর কসম যার হাতে আমার প্রাণ আছে! তোমরা অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে, তা না হলে শীঘ্রই আল্লাহ তাআলা তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর আযাব পাঠাবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর কাছে দু'আ করবে; কিন্তু তা কবুল করা হবে না।" (আহমাদ, তিরমিযী ২১৬৯, সহীহুল জামে ৭০৭০)

হাদিস সম্ভার, হাদিস নং ১৬০৪
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدَىً كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أجُورِ مَنْ تَبِعَه لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أجُورِهمْ شَيئاً وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيئاًرواه مسلم

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি (কাউকে) সৎপথের দিকে আহবান করবে, সে তার প্রতি আমলকারীদের সমান নেকী পাবে। এটা তাদের নেকীসমূহ থেকে কিছুই কম করবে না। আর যে ব্যক্তি (কাউকে) ভ্রষ্টতার দিকে আহবান করবে, তার উপর তার সমস্ত অনুসারীদের গোনাহ চাপবে। এটা তাদের গোনাহ থেকে কিছুই কম করবে না।" (মুসলিম ৬৯৮০ প্রমুখ)

হাদিস সম্ভার, হাদিস নং ১৬১২
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

খ্রিস্টান মিশনারী অপতৎপরতা প্রতিরোধের উপায় সমূহ

এ পরিস্থিতিতে আমাদের যা করণীয় বা বাস্তবতার ভিত্তিতে যে উপযোগী কৌশল ও শর'ঈ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, তা নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

(১) সকল মুসলিম, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের সন্তানদের অন্তরে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস মৌলিকভাবে গেঁথে দেওয়া। আর তা করতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাধারণ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, সকল প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাগারে সরকারী ও জাতীয় ভিত্তিতে।

(২) মুসলিম জাতির সর্বস্তরে দীনের বাস্তব জ্ঞানের সম্প্রচার এবং হৃদয়ে দীনী আত্মমর্যাদা, পবিত্রতা ও মর্যাদাবোধ পুরোপুরি জাগ্রত করা।

(৩) খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের যাবতীয় উপকরণ: ফিল্ম, পত্র-পত্রিকা, প্রকাশনা-প্রচারণা ইত্যাদির প্রবেশ পথ চিহ্নিত করতঃ এগুলোর অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করা এবং এর অবাধ্যতায় দমনমূলক শাস্তিবিধান করা।

(৪) জনসাধারণকে তাদের পাতানো ফাঁদ থেকে বাঁচানো ও সাবধান করার জন্য খ্রিস্টানদের মিশনের ভয়াবহতা, অপকৌশল ও পন্থাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত থাকা ও সচেতনতা সৃষ্টি করা।

(৫) মুসলিমের জীবনের সকল মৌলিক দিকগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা, বিশেষ করে স্বাস্থ্যগত দিক ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে যত্নবান থাকা, কেননা বাস্তবে যা ঘটছে তা হলো খ্রিস্টানরা এ দুটি মারাত্মক পথেই মানুষের অন্তরে ও মগজে ঢুকে পড়েছে।

(৬) প্রত্যেক মুসলিমের উচিৎ, সে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যে কোনো পরিস্থিতির শিকার হোক না কেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে তার দীন ও আকীদাকে মজবুতভাবে ধারণ করা এবং সে ব্যক্তিগত ও তার অধীনস্থদের জীবনে ইসলামী নিয়ম-নীতি ও নির্দেশাবলীকে যতদূর সম্ভব সু-

প্রতিষ্ঠিত করা, যার ফলে তার বাড়ীর প্রতিটি সদস্য যেন ব্যক্তিগতভাবে তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত ঈমান, আকীদা ও চরিত্র বিনষ্টকারী সংগ্রামের মুকাবিলায় সুরক্ষিত থাকতে পারে।

(৭) বিশেষ জরুরি প্রয়োজন, যেমন চিকিৎসা বা এমন প্রয়োজনীয় শিক্ষা যা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে অবর্তমান, এমন উদ্দেশ্য ব্যতীত কোনো ব্যক্তি ও পরিবারের কাফির রাষ্ট্রে ভ্রমণ করা থেকে সাবধান থাকা। আর উক্ত প্রয়োজনে যদি ভ্রমণ করতে হয় তবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ধর্মীয় ফিতনা ও সংশয় প্রতিহত করার প্রস্তুতি সাথে থাকতে হবে।

(৮) মুসলিমদের মধ্যে সামাজিক সহযোগিতা, সৌহার্দ্য ও সংহতি গড়ে তুলতে হবে; যার ফলে মানবাধিকার রক্ষিত হবে এবং মুসলিমদের যাবতীয় অভাব দূরীকরণে সমবায়ভিত্তিক জনকল্যাণমুখী দাতব্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে, এর ফলে তাদের অভাব ও দারিদ্র বিমোচনের নামে খ্রিস্টানদের কালো থাবা তাদের ওপর প্রসারিত হবে না।
কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন -

مَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسۡمَآءٗ سَمَّيۡتُمُوهَآ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلۡطَٰنٍۚ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ
أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ۝

সূরা ইউসুফ:৪০

তাঁকে ছেড়ে তোমরা যার ইবাদত করছ, তার সারবত্তা কতগুলো নামের বেশি কিছু নয়, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদাগণ রেখে দিয়েছ। আল্লাহ তার পক্ষে কোনও দলীল নাযিল করেননি। হুকুম দানের ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নেই। তিনিই এ হুকুম দিয়েছেন যে, তোমরা তার ভিন্ন অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল-সোজা পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে তাঁর সুন্দর-সুন্দর নাম ও উচ্চ গুণাবলীর উসীলায় প্রার্থনা করি, তিনি যেন মুসলিমদের বিক্ষিপ্ততাকে একত্রিত করে দেন, তাদের পরস্পরের আন্তরিকতাকে সুদৃঢ় করেন, তাদেরকে সংশোধন করেন এবং প্রশান্তির পথে তাদেরকে পরিচালিত করেন, পক্ষান্তরে শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন, তাদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রদান করেন, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় অশ্লীলতা ও ফিতনা থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন। নিশ্চয় তিনি অতিশয় দয়াবান।

হে আল্লাহ! যে কেউ ইসলাম ও মুসলিমদের অনিষ্ট সাধনের ইচ্ছা পোষণ করে তাকে তার নিজের ব্যাপারে ব্যস্ত রাখো, তার ষড়যন্ত্র তার ঘাড়ে ফিরিয়ে দাও এবং তার সকল অনিষ্ট পোষণের গন্ডি তার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখ, নিশ্চয় তুমি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

আল্লাহ তাআলা বলেন -

مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

সূরা হাজ্জ:৭৪

তারা আল্লাহর যথাযথ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রান্ত।

খ্রিস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে একজন দায়ীর সফলতা ও কিছু প্রস্তাব

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের শেষ দিকে একটি জেলার নাম কুড়িগ্রাম। আয়তন ২২৪৫.০৪ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ২২৫০৯৭৪ জন। উপজেলা ৯ টি, ইউনিয়ন ৭২ টি, গ্রাম ১৮৭২। বেশ বড় একটি জেলা হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় উন্নয়নের ছোঁয়া তেমন পায়নি। এ জেলারই একটি গ্রাম চিটপাইকেরছড়া। যা ভুরুঙ্গিমারী উপজেলার একেবারেই শেষদিকে ভারত সীমান্তের কাছে। দুর্গম ও উলামায়ে কেরামের পদচারণা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ধর্মান্তরকারী এনজিওগুলোর অপতৎপরতার অনুকূল জায়গা। অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যে জর্জরিত উত্তরের অনেক জনপদের মত চিটপাইকেরছড়াতেও প্রবেশ করেছে ঈমান হরণকারী একটি এনজিও। প্রেস ভেটেরিয়ান চার্চ অব বাংলাদেশ নামে এ এনজিওটি ২০০০ সাল থেকে সেবার খোলসের নিচে তাদের নোংরা উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ধর্মান্তরকরণের লক্ষ্য হাসিলের জন্য তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে এলিজাবেথ মেমোরিয়াল স্কুল নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পল্লী সমাজে নিরক্ষতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের মোহনীয় শ্লোগানের আড়ালে অব্যাহত রেখেছে ঈমান লুটের ধারা ।

তাদের আরেক শিরোনাম স্বাস্থ্যসেবা। এ শিরোনামে নামি-দামি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সেই পল্লিতে হাজির করা হয়। এভাবে নানা শিরোনামে ষোল বছরের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় এনজিওটি এই গ্রামের প্রচুরসংখ্যক মুসলমানকে খ্রিস্টানে পরিণত করে, যার একটি অংশ প্রকাশ্যে খ্রিস্টান পরিচয় দিত আরেক অংশ পরিচয় গোপন রাখত। এ কারণে সুনির্ধারিতভাবে সংখ্যা বলা মুশকিল। তবে প্রতি রবিবারে গীর্জায় উপস্থিতির সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছিল।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ২০১৪ সালের বিশ্ব ইজতেমা থেকে বিশোধিক সাথীর একটি জামাত নিয়ে ঢাকার প্রসিদ্ধ একজন হার্টের ডাক্তার ভুরুঙ্গামারী সফর করেন। তার বর্ণনা শুনেই আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে, তাহলে তার না জানি কী হয়েছে। চিল্লার ১৭ দিন তারা একই মসজিদে দিনে ঘাম ঝরিয়েছেন আর রাতে অশ্রু ঝরিয়েছেন। আর ভেবেছেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে কীভাবে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে, যে উম্মতের জন্য তিনি নিজ আত্মীয়-স্বজন মাতৃভূমি সবই ত্যাগ করেছেন। মা যেমন তার সন্তানের জন্য সব উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য তার চেয়ে বেশি উৎসর্গ করেছেন। মায়ের বুক খালি করে তার সন্তানকে ছিনিয়ে নিলে যদি আপনি ব্যথিত হন তাহলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে ছিনিয়ে নিলে কেন ব্যথা জাগবে না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত আমি তার কাছে তার জান-মাল পিতা-মাতা ও সন্তানাদির চেয়েও প্রিয় না হব।”

ঈমান যা এক মুমিনের মহা মূল্যবান সম্পদ যা রক্ষা করার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষ কত ত্যাগ স্বীকার করেছেন; তাঁদের গলায় রশি বেঁধে অলিগলিতে টানা হত, মরুভূমির উত্তপ্ত পাথুরে জমিনে শায়িত করে বুকে পাথর চাপা দেয়া হত- সেই মহাসম্পদ চিটপাইকেরছড়া গ্রামে ৫০০/১০০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বিক্রেতার সংখ্যাও একেবারেই কম নয়।

বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে এই গ্রামটি যিয়ারতের ইচ্ছা পূরণ হচ্ছিল না। অবশেষে গত ত্রৈমাসিক পরীক্ষার সময় ছবক স্থগিত হলে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এবার ইনশাআল্লাহ এই গ্রাম সফর করব।

এই গ্রামে প্রথম যারা দাওয়াত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন মাওলানা আনীসুর রহমান সাহেব তাদের অন্যতম। এবারের সফরে তিনি কিছু সাথী নিয়ে একটি গাড়িতে আর আমরাও কিছু আহবাবকে নিয়ে আরেকটি গাড়িতে আল্লাহর নামে সফর শুরু করি। ৫/১১/১৬ ঈ. সকাল ৬.০০ প্রথমে কাকরাইল মসজিদে গেলাম, সেখান থেকে শহীদুল ইসলাম ভাইকে নিয়ে বার ঘণ্টার রাস্তা পার হয়ে রাত ৭.০০ কুড়িগ্রাম পৌঁছলাম। সফরসঙ্গী ৬ জন। খাবারের পর চিটপাইকেরছড়া গ্রামের একটি মাদরাসায় গিয়ে বসলাম। ধীরে ধীরে এলাকার খোঁজ-খবর পাওয়া গেল।

‘প্রেস ভেটেরিয়ান চার্চ অব বাংলাদেশ’ নামে একটি এনজিও ২০০০ সালে এখানে কাজ শুরু করে। এর প্রধান বেচাং ওয়ার্ড আইউব। বাড়ি চট্টগ্রাম। সেও একজন ঈমান বিক্রেতা, এখন সওদাগর। গাজিপুর জেলার মিকি পাড়ায় এর প্রধান কার্যালয়। জামালপুরের মাদারগঞ্জ,

বরিশালের গলাচিপা, ময়মনসিংহের গরিপুরসহ নেত্রকোণা, কুষ্টিয়া ও মানিকগঞ্জে এর কার্যক্রম বিস্তৃত।

এরা এদের কার্যক্রমকে তিনটি শিরোনামের অধীনে পরিচালিত করে : ১. শিক্ষা-প্রোগ্রাম ২. কৃষি প্রোগ্রাম ৩. ধর্মীয় প্রোগ্রাম। এরা এই গ্রামে ২০০৪ ঈ. সালে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে সরকারী নিবন্ধের আওতায় নিয়ে আসে। ২০০৬ ঈ. এলিজাবেথ মেমোরিয়াল স্কুলে ক্লাস শুরু হয়। এই সালেই গীর্জা প্রতিষ্ঠা করে। গীর্জার উপরে লেখা আছে 'অসহায় ছিন্নমূলদের সেবায় নিয়োজিত'। গীর্জায় লেখা এই বাক্যটি তাদের সেবার লক্ষ্য উদ্দেশ্য পরিষ্কার বর্ণনা করছে। সেবার শিরোনামে ধর্মান্তরিতকরণই যে এদের প্রধান কাজ এতে লুকোছাপা কিছু নেই।

আজাদ ফকীর নামে এক লোক এদেরকে এই গ্রামে নিয়ে আসে। তার জমিতেই খ্রিস্টানরা স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করে। জহুরুল নামে এক লোক এখানে এই গীর্জার রক্ষণাবেক্ষণ করত। ১৯৯২ সালে সে এদের দলভুক্ত হয়। মহান আল্লাহর শোকর, তিনি এই আজাদ ও জহুরুলকে হেদায়েত দিয়েছেন। শত বারের উপর গাশত করার পর গত কয়েক মাস আগে দুজনই ইসলাম কবুল করেন।

ধর্মান্তরিতের তুফানসম ফিতনা দেখে আমরা অনেক সময় হাল ছেড়ে মূসা আলাইহিস সালামের কওমের মত বলি, আমাদের কিছু করার দরকার নেই। আল্লাহর দ্বীন আল্লাহই রক্ষা করবেন-

اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُون.

'তুমি আর তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ কর আমরা এখানে বসে থাকব।'

মনে রাখতে হবে এই একটি চিন্তাই এ উম্মতের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

২০১৪ সালে মাওলানা আনীসুর রহমান সাহেব তার অতি সাধারণ এক ছাত্র মাওলানা শামীমকে সাল লাগানোর পর এখানে দাওয়াতের এই কাজে পাঠিয়ে দেন। আমি নিজেও কয়েকজনকে প্রস্তুত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। শামীমের ইলম, বয়ান, উপস্থাপনা কোনটাই উল্লেখ করার মত ছিল না। তার চেয়ে অনেক যোগ্য ও মেধাবী ছাত্র আমাদের আশেপাশে ঘুরছে কিন্তু যে কাজ আল্লাহ পাক শামীমকে দিয়ে করিয়েছেন তা দায়ীদের জন্য স্মরণীয় পাথেয় হতে পারে। খুব সংক্ষেপে বিষয়টি তুলে ধরছি :

১. ইরতেদাদের ফেৎনা এখানে এক ভয়াবহ তুফানের রূপ ধারণ করেছিল। আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা সে তুফান থামিয়ে এখন ঈমানী সুবাতাস প্রবাহিত করেছেন। ফলে এ পর্যন্ত ৪২ জন খ্রিস্টান ইসলাম কবুল করেছে। পরিচয় গোপন রাখা কিছু পথহারা মুসাফির এখনও ঘরে ফিরতে পারেনি। আল্লাহ তাআলা ৪২ জন ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

২. দাওয়াতের মেহনতকে ঘরে ঘরে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এক বিশাল সফলতা আল্লাহ তাআলা দান করেছেন। যার প্রমাণ হল ৫/১১-এর মাহফিলে প্রায় ১০ হাজার পুরুষ ও ১২ হাজার (আনুমানিক) মহিলা শরীক হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে কে সময় লাগিয়েছেন? সবাই হাত উঠাল। স্টেজে বসা উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব নূরুন্নবী সাহেবও তিন দিন লাগিয়েছেন। দুই বছরে মাওলানা শামীম ৫৭ জনকে চিল্লায় বের করেছে। যার কারণে এখন মসজিদভর্তি মুসল্লী ও মজলিসভর্তি দ্বীনদার শ্রেণি। আর মাদরাসাভর্তি তালিবুল ইল্ম, যা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

৩. শিক্ষা কার্যক্রম হচ্ছে যে কোনো আদর্শের অন্যতম মূল বাহন। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এলাকার লোক ইসলাম গ্রহণ করলে সেখানে মুয়াল্লিম পাঠিয়ে দিতেন। সেই ধারাবাহিকতায় আমাদের মাশায়েখ মক্তবের উপর খুব জোর দিতেন। সে চিন্তা করেই চিটপাইকেরছড়া গ্রামে দুই বছর আগে একটি মাদরাসা কায়েম করা হয়েছে। যেখানে ২৫০ শিশু পড়াশুনা করে। এদের মধ্যে ১০৪ জন এলিজাবেথ মেমোরিয়াল স্কুলের ছাত্র এবং ঈমান ছিনতাইয়ের ফাঁদের শিকার মুসলমানদের সন্তান। ৬/১১/১৬ ঈ. রবিবার সকালে আমরা শিশুদের নিয়ে বসলাম। দ্বীন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে শিশু উপযোগী কিছু আলোচনা হল। তারপর দুআ হল। মুসলমানকে গীর্জায় নিয়ে প্রার্থনা করানোর কথা শুনে হৃদয়ে যে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল সেই রক্তই যেন তপ্ত অশ্রু হয়ে প্রবাহিত হল।

মাদরাসার জন্য একজন নতুন চিল্লার সাথী প্রায় এক বিঘা জমি দান করেছেন। ৭.৭ ফুট গর্ত ছিল। ২১৬০০০ টাকার মাটি সেখানে ফেলা হয়েছে এবং টিন দিয়ে চারটি ঘর তৈরি করা হয়েছে। ঐ ঘরগুলোতেই ২৫০ শিশুর শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। রবিবার সকালে আমাদের আরও তিনটি মজলিস হয়েছে। একটি সফরের সাথীদের নিয়ে। যে মজলিসের উদ্দেশ্য ছিল, তারা যে মুসলমানদের খ্রিস্টান বানিয়ে ফেলেছে- এ বিষয়ে আমাদের করণীয় কী। দ্বিতীয় মজলিস এলাকার গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে। সেখানে মূলকথা ছিল, আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করলে আল্লাহ তাআলা তাকে কীভাবে পুরস্কৃত করেন। তৃতীয় মজলিস ছিল শিক্ষকদের সাথে। সেখানে মূলকথা ছিল, একটি পণ্য ফ্যাক্টরী থেকে যে রূপ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বের হয় সেই রূপের আর পরিবর্তন হয় না। মাদরাসা হচ্ছে ঈমানদার তৈরির ফ্যাক্টরী, এখান থেকে একজন ছাত্র যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বের হবে, শেষ দিন পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ সে অবস্থায়ই থাকবে। তারপর আমরা

কুড়িগ্রাম তাবলীগী মার্কাযে এসে সকালের নাস্তা সারলাম। এরপর ঢাকায় রওনা করে রাত ১১. ৩০ মি: বাসায় পৌঁছলাম।

কুড়িগ্রামে রাস্তার পাশে অসংখ্য মসজিদ চোখে পড়ে, যা আরবদেশের বিভিন্ন সংস্থা তৈরি করেছে। কিন্তু মসজিদ পাকা করার সাথে সাথে মুসল্লি পাকা করার মেহনত না থাকায় মসজিদগুলোতে প্রাণের স্পন্দন নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মসজিদ কাঁচা ছিল মুসল্লি পাকা ছিল, আমাদের মসজিদ পাকা কিন্তু আমরা মুসল্লিরা কাঁচা।

রাতে যখন আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছিলাম তখন দেখেছি মাদরাসা ও মাহফিল নিয়ে ধারণাতীত উৎসাহ-উদ্দীপনা। আর পুরা রাস্তায় জনস্রোত। মাহফিলের শামিয়ানা পরিণত হয়েছিল সকল স্রোতের মোহনায়।

প্রিয় পাঠক! একজন মা যদি প্রসব বেদনা সহ্য করার জন্য প্রস্তুত না হন তাহলে একটি শিশুর জন্মও হয় না, কারো মুখে হাসিও ফোটে না। এখানেও একজন দায়ীকে ‘প্রসববেদনা’ সহ্য করতে হয়েছে, যার ফল সবার মুখের হাসি। ১৩/৪/২০১৪ সালে এই গ্রামে এসে তাকে যাযাবরের মত ১৩টি মাস কাটাতে হয়েছে রাতে চোখের পানি দিয়ে বুক ভাসিয়েছেন আর দিনে আক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এইভাবে ১৩ মাস মেহনতের পর মাদরাসার জায়গার ব্যবস্থা হয়।

এই গ্রামের পাশেই রুপকুমার নদী। খ্রিস্টানরা কাউকে খ্রিস্টান বানাতে চাইলে এই নদীতে তাকে গোসল করাত। এই গোসলের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করত। এই কাজকে তারা ব্যাপটিজ বলে। আরবীতে- استصباغ বলে। একজনকে এনে গোসল দেয়াতে পারলে ১০০০০ হাজার টাকা দেয়া হত। এটা তাদের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসা মুসলমানদের বক্তব্য।

উপায়-উপকরণ ছাড়া কেবল আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুহাব্বত আর এখলাসের মধ্যে আল্লাহ যে কত শক্তি রেখেছেন- চিটপাইকেরছড়া গ্রামটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গত নভেম্বর মাসের শুরুতে এনজিওপ্রধান কুড়িগ্রাম জেলার ডাকবাংলোতে গিয়েছেন, গিয়ে যখন শুনলেন তার পাতা জালে আর মাছ ধরা পড়ছে না তখন চরম হতাশা প্রকাশ করেন। আর কোটি কোটি টাকার লস প্রজেক্ট দেখতে পেয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে কুড়িগ্রাম থেকে বিদায় নেন।

আসলে এই উম্মতের বড় প্রয়োজন কিছু উৎসর্গিতপ্রাণ মুসলিম দায়ীর, যাদের সবকিছু হবে আল্লাহর জন্য। ঈমান হবে হিমালয়ের মত। যাদের পরিচয় হবে ‘রুহবান ফিল লাইল্, ফুরসান

ফিন নাহার’। যদি সত্যিই তাদের পাওয়া যায় তাহলে ইসলাম সোনালী প্রভাতের রক্তিম সূর্য হয়ে আবার উদিত হবে। কবি ফররুখের ভাষায়-

আবার বিলাল হাঁকিবে আযান মক্কার ঐ মিনার চূড়ে/হায়দারি হাঁক হাঁকবোরে ফের উঠব আবার বিশ্ব ফুঁড়ে।

উলামায়ে কেরামের খেদমতে গুযারিশ

আমরা যতটা রসমের কাছে পরাজিত ততটা হাজতের কাছে পরাজিত নই। আমাদের এই মুহূর্তে দরকার কিছু দায়ী, যারা এরতেদাদের তুফানে জর্জরিত প্রতিটি এলাকায় বসে যাবে। এর জন্য খুব মেধাবী হতে হবে এমন নয়। হতে হবে পরিশ্রমী ও মুখলিস। হতে হবে দ্বীনের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দেয়ার মানসিকতার অধিকারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে শাহজালাল ইয়ামানী, খান জাহান আলী পর্যন্ত এবং এর পরেও এক বিশাল জামাত দ্বীনের জন্য ছিন্নমূল হয়েছেন। ইসলামের মৃত এই সুন্নতকে যিন্দা করলে কাদিয়ানী ও মিশনারী ফেতনার চলমান তুফান ইনশাআল্লাহ থেমে যাবে। কারণ আমাদের কাছে কুরআন-সুন্নাহ, আল্লাহ্র আযমত ও আখেরাতের অনুভূতি এবং সীরাতে সাহাবার মত পুঁজি ও পাথেয় আছে, যা অন্য কারোর কাছে নেই। এখন প্রয়োজন বিধি মত কাজে লাগানো। দেশে কয়েকটি জায়গায় এর মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা আমাদের সফলতা দিয়েছেন। এ জন্য দরকার ইলম ও হেকমত, ইখলাস ও আখলাক এবং জনসাধারণকে সাথে নিয়ে চলার যোগ্যতা। আর এই সকল গুণের জন্য প্রয়োজন এখলাস ওয়ালাদের সোহবত ও শায়খে কামেলের সাথে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করা।

যেহেতু এ সকল বাতিল ফেরকা তাদের দায়ীদের প্রশিক্ষণ দেয়, তাই আমাদের দায়ীদেরও কিছু প্রশিক্ষণ দরকার। বড়রা চিন্তা করবেন, এমন হতে পারে কি না যে, এক বছরকে তিন ভাগ করে একভাগ তিন চিল্লায়, একভাগ সোহবতে, একভাগ মুতালাআয় লাগানোর পর এমন আক্রান্ত এলাকায় বসিয়ে দেয়া হল। ইখলাস ও ইতকানের সাথে কাজ করলে আল্লাহ তাআলা তার সাহায্যের ওয়াদা সেখানেও বাস্তবায়ন করবেন ইনশাআল্লাহ। আমাদের ফারেগীনদের একটি অংশও যদি এ কাজে চলে আসেন তাহলে মুসলমানের সন্তান মুসলমানিত্ব নিয়ে কবরে যেতে পারবে। দেখুন, পূর্বতীমুর আর দক্ষিণ সুদানের তিক্ত পরিস্থিতি আমাদের সামনে রয়েছে। আল্লাহ হেফাযত করুন, ঐ অবস্থার সৃষ্টি হলে আমাদের সাধারণ কাজগুলোও অস্তিত্বের সংকটে পড়বে। একবার হাত থেকে বের হওয়ার পর সেটা আর ফিরে আসে না। স্পেনকে মুসলিম উম্মাহ আর ফিরে পায়নি। বাহ্যত সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। তাই সময় থাকতেই উম্মতের

হেফাজতের ফিকির করতেই হবে। কম শ্রমে স্বল্প উপকরণে অধিক ফল পেতে হলে উপরের এ পন্থাকে কার্যকর ও নিরাপদ মনে হয়।

আমাদের দ্বীনী প্রতিষ্ঠানগুলোতে

التخصص في الرد على الفرق الباطلة

তথা 'কিসমুদ দাওয়াহ' গুরুত্বের সাথে নেয়া দরকার। এখন এক একটি প্রতিষ্ঠানকে এক একটি আক্রান্ত এলাকার দায়িত্ব নিতে হবে। কিছু দায়ী বেছে বেছে প্রস্তুত করতে হবে। মাদরাসা যদি তাদের দুনিয়াবী হাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহলে এ কাজ আরো সহজে হতে পারে। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন।

আল্লাহর পথে দাওয়াতের গুরুত্ব

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِى هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْم.

'ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে কার কথা উত্তম হ'তে পারে, যে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। সৎকর্ম ও অসৎকর্ম সমান নয়। প্রতুত্তর নম্রভাবে দাও, দেখবে তোমার শত্রুও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পরিণত হয়েছে' (হা-মীম সিজদা ৩৩-৩৪)।

আয়াতে দাওয়াতের গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। দাওয়াত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যার বিনিময়ে মানুষ সবচেয়ে উত্তম হ'তে পারে। এর ফলে পারস্পরিক শত্রুতা দূরীভূত হয় এবং বন্ধুত্ব ফিরে আসে। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বভাব ও ভালবাসার সৃষ্টি হয়।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَتَوَاصَوا بَالصَّبْرِ وَتَوَاصَوا بِالْمَرْحَمَةِ- أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.

'অতঃপর (আল্লাহর নৈকট্য তারাও লাভ করতে পারে) যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরে ধৈর্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরে দয়া করার উপদেশ দেয়। তারাই হল ডানপন্থি, তারাই সফল'

(বালাদ ১৭)। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ দাওয়াতের মাধ্যমে ঈমানদার হয়, ধৈর্যশীল হয় এবং পরস্পর দয়া ও করুণা করতে শেখে, যা মানব সমাজে নিতান্ত প্রয়োজন।

আল্লাহ বলেন,

وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسرٍ، إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَوْا بِالصَّبْرِ.

‘কালের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিপতিত। তবে তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, পরস্পরকে হকের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়’ (সূরা আছর)। এ সূরাটি মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লা্হ তা‘আলা এখানে হক্ব এর দাওয়াত দিতে বলেছেন। আর হক্ব এর দাওয়াত দিতে গিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হ’লে ধৈর্যধারণ করতে বলেছেন এবং পরস্পরকে হক্বের উপদেশ দানকারী ক্ষতিগ্রস্ত নয় বলেছেন।

عَنْ أَبيْ مَسْعُوْدِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِه.

আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কল্যাণের পথ দেখাবে সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ নেকী পাবে, যে ঐ পথে চলবে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯; বাংলা মিশকাত ২য় খন্ড, হা/১৯৯ ‘ইলম’ অধ্যায়)।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ... مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُّنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئٌ وَمَنْ سَنَّ فِيْ الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُّنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئٌ.

জারীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি (দাওয়াতের মাধ্যমে) ইসলামের একটি (মৃত) সুন্নাত চালু করবে সে তার নেকী পাবে এবং ঐ সুন্নাতের প্রতি মানুষ আমল করে যত নেকী পাবে তাদের সমপরিমাণ নেকী তার আমলনামায় লেখা হবে, তবে তাদের কারো নেকী কমকরা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ আমল চালূ করবে সে জন্য তার পাপ রয়েছে। আর ঐ মন্দ আমল করে যত লোক যে পরিমাণ পাপ অর্জন করবে সবার সমপরিমাণ পাপ তার আমলনামায় লেখা হবে, তবে তাদের কারো পাপ এতটুকুও কম করা হবে না’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২১০; বাংলা মিশকাত ২য় খন্ড, হা/২০০‘ইলম’ অধ্যায়)।

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ نَضَّرَ اللهُ إِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى لَهُ مِنْ سَامِعٍ.

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির মুখমণ্ডল উজ্জল করুক যে ব্যক্তি আমার কোন হাদীছ শুনে এবং যেভাবে শুনেছে ঠিক সেভাবে অপরের নিকট পৌঁছে দেয়। কেননা অনেক সময় যার নিকট পৌঁছানো হয়, সে ব্যক্তি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী হয়' (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩০; বাংলা মিশকাত ২য় খন্ড, হা/২১৬ 'ইলম' অধ্যায়)। এ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দাওয়াত দানকারীর কল্যাণের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন।

عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسُ الْخَيْرَ وَالْآخَرُ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ هذَا الْعَالِمِ الَّذِيْ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِي يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ كَفَضْلِيْ عَلَى أَدْنَاكُمْ.

হাসান বাছারী (রাঃ) হ'তে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বনী ইসলাঈলের দু'জন লোক সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তাদের একজন ছিলেন আলেম। তিনি কেবল ফরয ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর লোকদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতেন। অপরজন ছিলেন আবেদ। যিনি দিনে ছিয়াম পালন করতেন এবং রাতে ছালাত আদায় করতেন। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? রাসূল (ছাঃ) উত্তরে বললেন, আলেম, যে শুধুমাত্র ফরয ছালাত আদায় করে এবং লোকদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয় সে উত্তম ঐ আবেদের চেয়ে, যে দিনভর ছিয়াম পালন করে এবং রাতভর ছালাত আদায় করে। উভয়ের মধ্যে মর্যাদার তফাত এরূপ যেমন আমার ও তোমাদের মধ্যে রয়েছে' (দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৫০; বাংলা মিশকাত ২য় খন্ড, হা/২৩৩ 'ইলম' অধ্যায়)।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَ حَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلِمَهُ وَ نَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ أَوْ مُصْحَفًا وَّرَثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِإِبْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ أَوْ نَهَرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মুমিনের মৃত্যুর পর যে সব নেক আমলের নেকী মুমিনের নিকট পৌঁছবে তা হচ্ছে (১) ইলম, যা শিক্ষা করেছে এবং দাওয়াতের মাধ্যমে প্রচার ও প্রসার করেছে (২) নেক সন্তান, যাকে পৃথিবীতে রেখে গেছে (৩) কুরআন, যা ওয়াকফ করে রেখে গেছে। (৪) মসজিদ, যা সে নির্মাণ করে গেছে (৫) সরাইখানা, যা সে পথিকের জন্য নির্মাণ করে গেছে (৬) খাল, যা সে খনন করে গেছে অথবা ছাদাক্বা, যা সে সুস্থ ও জীবিত

থাকাবস্থায় দান করে গেছে' (ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৫৪; বাংলা মিশকাত ২য় খন্ড, হা/২৩৭ 'ইলম' অধ্যায়)।

عن عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَه.ُ

ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়'। অর্থাৎ প্রচারের মাধ্যমে অপরকে শিক্ষা দেয় (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়)।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَّغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ الْعَقِيْقِ فَيَأْتِيْ بِنَقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِيْ غَيْرِ إِثْمٍ وَلاَ قَطْعِ رَحْمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ كُلُّنَا يُحِبُّ ذَلِكَ فَقَالَ أَفَلاَ يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُعَلِّمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ نَّاقَةٍ أَوْ نَاقَتَيْنِ وَثَلاَثٌ خَيْرٌلَّهُ مَنْ ثَلاَثٍ وأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَّمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ.ِ

ওক্কবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা বাড়ী থেকে বের হলেন, তখন আমরা আহলেছুফফার সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বললেন, 'তোমাদে মধ্যে কে এমন আছে যে বুত্বহান অথবা আক্বীক্ব নামক স্থানে যাবে এবং দু'টি মোটা তাজা উটনী নিয়ে আসবে। যা চুরিও নয়, ছিনিয়েও নেয়া নয়। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরা সবাই যেতে চাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি সকালে মসজিদে যাবে এবং দু'টি আয়াত শিখিয়ে দিবে অথবা (মানুষের সামনে) পরিবেশন করবে। এই আয়াত দু'টি উটের চেয়ে উত্তম, তিনটি আয়াত তিনটি উটের চেয়ে উত্তম, চারটি আয়াত চারটি উটের চেয়ে উত্তম। এভাবে যত আয়াত পরিবেশন করবে তত উটের চেয়ে উত্তম হবে' (মুসলিম, মিশকাত হা/২১১০)।

উপসংহার

আমাদের কাছে যতো নেয়ামত আছে তার মাঝে সবচে’ বড় ও মূল্যবান নেয়ামত হলো- ঈমানের নেয়ামত। ঈমানেরর এতো দাম যে, মৃত্যুর পর ঈমানের বিনিময়ে যদি দুনিয়ার মূল্যবান সবকিছু বিনিময় হিসেবে দেওয়া হয়- তবুও ঈমানের বিনিময় হতে পারবে না।

ঈমানের এতো দাম যে, যদি ঈমানের মতো সম্পদ কারো না থাকে; তাহলে তার সবকিছু মূল্যহীন। মহান আল্লাহতায়ালার কাছে সবচে’ বেশি দাম ঈমানের।

শেষ নবী হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যদি আল্লাহর নিকট বিন্দুমাত্র দুনিয়ার কোনো দাম থাকতো; তবে কোনো কাফেরকে একবেলা খাওয়াতেন না। আল্লাহর কাছে দুনিয়ার দাম একটি মশার পাখার সমানও নয়।
যদি একটি মশার পাখার সমানও দুনিয়ার দাম হতো- তবে একজন কাফেরকে আল্লাহ দুনিয়াতে রাখতেন না। ’

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দ্বীন প্রচার করা ফরজ বা একটি আবশ্যিক দায়িত্ব। প্রত্যেকে নিজের জ্ঞান, যোগ্যতা এবং সাধ্যানুযায়ী এই কাজে অংশগ্রহণ করবেন। আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের দাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন।
এ বিষয়ে কুরআন ও হাদিসে অনেক সওয়াবের কথা বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

“আপনি আপনার পালনকর্তার দিকে (মানুষকে) দাওয়াত দিন। আর আপনি অবশ্যই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না’ [সূরা কাসাস: ৮৭]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ

“তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। [আলে ইমরান: ১১০]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

»مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ«

"তোমাদের মধ্যে যে অন্যায় দেখবে সে যেন তা তার হাত দিয়ে বাধা দেয়, আর যদি হাত দিয়ে বাধা না দিতে পারে তবে যেন মুখ দিয়ে বাধা দেয়, আর যদি মুখ দিয়ে বাধা না দিতে পারে তবে যেন অন্তর দিয়ে বাধা দেয়, আর এটি হলো দুর্বল ঈমানের পরিচয়।" [সহিহ মুসলিম, হা/৪৯]

তিনি আরও বলেন,

بَلِّغُوا عَنِّي ولو آيَةً

"আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছিয়ে দাও।" [সুনান তিরমিজি-সহীহ]

আল্লাহর দীনকে প্রচার করার মর্যাদা অনেক বেশি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

"তোমার মাধ্যমে যদি আল্লাহ একজন লোককেও হেদায়েত দেন তবে তা তোমার জন্য একটি লাল উট পাওয়া থেকেও উত্তম।" [সহিহ বুখারী]

তিনি আরও বলেন,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدىً كانَ لهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجورِ منْ تَبِعهُ لاَ يَنْقُصُ ذلكَ مِنْ أُجُورِهِم شَيْئًا رواهُ مسلمٌ

"যে ব্যক্তি মানুষকে হেদায়েতের দিকে আহ্বান করে, সে ওই সকল লোকের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে, যারা তা অনুসরণ করে। তবে অনুসরণকারীদের সওয়াবের কোনও ঘাটতি হবে না।" [সহীহ মুসলিম]

দাওয়াতি কাজ থেকে বিরত থাকলে গুনাহগার হতে হবে:

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বোঝা যায়, প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সাধ্যানুযায়ী দাওয়াতি কাজ এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা ফরজ। যদি কেউ এই দায়িত্ব পালন না করে তবে ফরজ লঙ্ঘন করার কারণে সে গুনাহগার হবে।

সাধারণ মানুষের জন্য দাওয়াতি কাজের পদ্ধতি:

১. দ্বীনের কাজে আর্থিক সাহায্য প্রদান।
২. দাওয়াতি কাজে নিজের শ্রম ও সময় ব্যয় করা।
৩. পরিবারে দাওয়াত: একজন গৃহিণীর জন্য সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হলো তার পরিবার।
৪. কর্মস্থলে দাওয়াত:
— একজন শিক্ষক তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।
— একজন ডাক্তার তার চেম্বারে।
— একজন ছাত্র তার সহপাঠীদের মধ্যে।
৬. আচরণের মাধ্যমে দাওয়াত: কর্মক্ষেত্রে সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য প্রদর্শন করা। এভাবে প্রত্যেক মুসলমান নিজের সাধ্য ও সুযোগ অনুযায়ী এই মহান দায়িত্ব পালন করবে। আল্লাহু আলাম।

রেফারেন্স

মাসিক আল কাউসার
মাসিক আত তাহরীক
Hadithbd
Muslim Bangla
উইকিপিডিয়া
Wordpress.com
Rahmat news
আল হাদিস অ্যাপ, irdfoundation.com
বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারি অপতৎপরতা ও আমাদের করণীয়,লেখক: মাওলানা মুফতি জুবায়ের আহমেদ, বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ, গবেষক ও দাঈ।